সহানুভূতি।

সহানুভূতি।

শ্রীতারিণীচরণ সেন প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩০৯

মূল্য আট আনা মাত্র,
(রাজ সংস্করণ এক টাকা।)

পূর্ব্বাভাষ।

সহানুভূতি শব্দটি আজ কাল কতক পরিমাণে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি ইহার মৌলিক প্রসার ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এ গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

দেশে সহানুভূতির বড় অভাব। জাতীয়-জীবন সহানুভূতিপরায়ণ হইলে আমরা উন্নতির অচল-শিখরে পুনরায় অধিরোহণ করিতে পারিব, আশা করা যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তক সেই আশার স্ফুরণে লিখিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক মণ্ডলী আমার এ "সহানুভূতিকে" সহানুভূতির চক্ষে দেখিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীতারিণীচরণ সেন।

সূচী।

—ঃ০ঃ—

সহানুভূতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একাধিক হৃদয়ে একই ভাবানুভূতির নাম সহানুভূতি। তোমার সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখানুভবই সহানুভূতি। এই যুগপৎ অনুভূতির বিকাশ অধ্যাত্মরাজ্যে আত্মজ্ঞান বা একপ্রাণতার পরিণাম বলিয়া পরিচিত। গীতার মর্ম্মানুসারে এই বিশ্বের সমুদায় দেহের দেহী বা আত্মা যদি অখণ্ডৈকরূপ এক বিরাট অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হয়েন, তবে নিশ্চয়ই যিনি যে পরিমাণে মায়া বা অবিদ্যামুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে সহানুভূতির বিকাশ হইবে। এই জন্যই পুরাণে দেখি, কে একবার অশ্বত্থ বৃক্ষের ত্বকচ্ছেদ করিয়াছিল বলিয়া ভগবদ্দেহেও ত্বকচ্ছেদ দৃষ্ট হইয়াছিল।

সহানুভূতি কল্পনা শক্তির ফল *। আমি যদি কল্পনাবলে আমার আপনার হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে অপর হৃদয়ের অবস্থা

---

* Habits of reflection, with some experience of misfortune, do greatly promote sympathy.

James Beattee L. L. D.

বা ভাব প্রতিফলিত করিতে পারি, তাহা হইলেই তাহার সহিত আমার সহানুভূতি জন্মে। একজন দুঃখের মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিতেছে, আমি যদি কল্পনাবলে তাহার সে যাতনা কি, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারি, তাহাহইলেই তাহার সহিত আমার সহানুভূতি হইল। যে মুহূর্ত্তে সেই অনুভূতি হইবে, অমনই তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারেচ্ছা আসিয়া আমাদের হৃদয়কক্ষে উপস্থিত হয়। সেই ইচ্ছার নাম দয়া। দয়া সহানুভূতিরই প্রিয়তমা তনয়া। ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি সহানুভূতির আরও কতকগুলি সন্তান সন্ততি আছে। সহানুভূতি তাহাদের দ্বারা তাহার অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। ইঁহারা সকলেই বড় মাতৃভক্ত,—মাতৃগত প্রাণ।

মানবমনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সহানুভূতি দুই ভাবে তাহার কার্য্যকারিণীশক্তি বিকাশ করে। কোথাও দাসীরূপে, কোথাও বা কর্ত্রীরূপে। শুদ্ধ কল্পনাকে লইয়া যেখানে কাজ করে, সেখানে দাসীস্বরূপা; আর যেখানে সে তাহার প্রিয়তম সন্তান সন্ততি গুলির স্নেহাধীন হইয়া কার্য্য করে, সেখানে কর্ত্রীস্বরূপা। যেসকল মানবের হৃদয়ে কল্পনাশক্তি প্রবলা, তাহাদের কাছে সহানুভূতি দাসীরূপে কাজ করে। তাহারা যখন ডাকে, কেবল তখনই সহানুভূতি আসে, প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় নীরবে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। আবার যাহাদের অন্তরে প্রীতি, দয়া প্রভৃতি কোমলবৃত্তিসকল প্রবল, তাহাদের পক্ষে উহা স্বাভাবিক; কল্পনার জন্য বসিয়া

থাকে না। তাহারা আপনারাই আপনাদের কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। (কিন্তু মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে কল্পনা ভিন্ন সহানুভূতি নাই। তবে কোথাও ইহার কার্য্য এত শীঘ্র সম্পাদিত যে, কল্পনাশক্তি যে সেখানেও প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহা সহজে অনুভব করিতে পারি না।) সেখানে সহানুভূতি হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়াই আছে সহানুভূতিই তাহাদের অধীশ্বরী।

সহানুভূতি কেবল শোক, দুঃখেরই সহচরী নহে। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, হিংসা সকলেরই তুল্য সহচরী। এতদ্ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কোবিদদিগের দুই মত। কেহ বলেন, "সহানুভূতি কেবল সমান অবস্থাপন্ন (for our equals) ব্যক্তির দুঃখেরই সাঙ্গনী। সুখ, দ্বেষ, হিংসাদির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলের সহিত যেখানে তুল্যানুভূতি হইবে, সেইস্থলে তাঁহারা Sympathy না বলিয়া Fellow-Feeling বলিয়া থাকেন।" অপরে বলেন, "সহানুভূতি বিশ্বব্যাপিনী ও বিশ্বদ্রাবিনী।" আমরাও এই মতের পক্ষপাতী। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহার গতি সর্ব্বত্র সমান। বাস্তবিক এমন বিশ্বব্যাপিনী শক্তি আর কাহারও নাই। উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে গভীর সমুদ্রতল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ কর, অনন্ত জ্যোতিষ্কে জ্যোতিষ্কে, গ্রহ উপগ্রহে, জড় অজড়ে অন্বেষণ কর, বিজন বিপিনে বিপিনে, বিশাল মরুতে মরুতে চাহিয়া দেখ, সর্ব্বত্রই সহানুভূতির একটা বিশ্বব্যাপিনী

একপ্রাণতা দেখিতে পাইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহার সর্ব্ব-ব্যাপিনী শক্তির প্রসারণ সংসারক্ষেত্রেই সমধিক প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের এই বিশাল জীবসৃষ্টি, সহানুভূতির এক সুবিস্তীর্ণ মমতাময় লীলাক্ষেত্র। কোথায় কোন্ জীর্ণবাস-পরিহিত ক্ষুৎপিপাসাতুর রোরুদ্যমান অনাথ দীনবালক,—কোথায় কোন্ অতুল-সুখ-সম্পদ-রাজ্যভ্রষ্ট বিষাদ-বিমলিন ভাগ্যহীন নরপতি,—কোথায় কোন্ সমরক্ষেত্র-শায়ী-রুধিরাক্ত-কলেবর মুমূর্ষু সৈনিক-পুরুষ,—কোথায় কোন্ প্রিয়জন-সমাগম-সুখ-বঞ্চিত অভিশপ্ত নির্ব্বাসিত যক্ষ,—কোথায় কোন্ স্বামি-সন্দর্শন-লাভ-লোলুপা বিরহ-বিধুরা নবোঢ়া, কোথায় কোন্ পতি-সোহাগ-বঞ্চিতা বিষাদ-বিমগ্না ম্রিয়মাণা রমণী,—কোথায় কোন্ জ্যোৎস্নাবিধৌত-লাবণ্য-গর্ব্বিতা ললিত-লবঙ্গ-লতা,—কোথায় কোন্ বিফল-মনোরথা মর্ম্ম-পীড়িতা কুপিতা-ফণিনী,—কোথায় কোন্ অস্ফুট-চন্দ্রালোকে প্রেমালিঙ্গন-বদ্ধা কুসুম-কোমলা ব্রীড়া-বিনম্রা স্ফুটনোন্মুখ-যৌবনা-তরুণী—কোথায় কোন্ নিভৃত-মন্দিরাভ্যন্তরে গৈরিকবসন-পরিহিতা নগ্নকেশা রুদ্রাক্ষমালিনী ভবানী-ধ্যান-নিরতা ভক্তি-বিহ্বলা বর্ষীয়সী যোগিনী, দেখিবে—সেইখানেই সহানুভূতি বিরাজ-মানা, আত্মস্মৃতি ভুলিয়া পরকে লইয়া বিব্রতা।

সহানুভূতির মন উন্নত, হৃদয় প্রশস্ত এবং সে সতত গতি-প্রবণা। কোন স্থলেই সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অগ্রসর হইতে

হইতে ক্রমশঃ তাহার কার্য্যপরিধি বাড়াইয়া লয়। প্রথমতঃ ব্যক্তি, তারপর জাতি, তারপর সমাজ, এবং অবশেষে সমগ্র জগৎ পর্য্যন্ত উহার পরিধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পৃথিবী যেমন তাহার মাধ্যাকর্ষিণী-শক্তিবলে আপনার ক্রোড়স্থ যাবতীয় পদার্থকে কিছুতেই দূরে অপসারিত হইতে দেয় না, এবং দূরের পদার্থনিচয়কে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া আনে, সহানুভূতিও সেইরূপ তাহার জ্ঞানসীমান্তর্ভূত ব্যক্তিনিচয়কে আপনার কাছে লইয়া আসে, এবং পরকে আপনার করিয়া ফেলে। ইহার কাছে জাতি-বর্ণ বিভেদ নাই, আত্ম-পর বিচার নাই। সবই এক,—সবই সমান,—সবই আপনার। এক-দিনের বা একমুহূর্ত্তের জন্যও আপনার ভাবনা ভাবে না। কেবলই পর—পরের জন্যই প্রাণধারণ। এমন পর-টানা-প্রাণ কাহারও দেখিলাম না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আকাজ্ক্ষা, প্রার্থনা সকলই বুঝি পরের জন্য। তাহার সমগ্র দেশ, সমগ্র জগৎ নিজের পরিবার। তাহার পরই পরিবার, পরই বন্ধুবান্ধব এবং পর লইয়াই তাহার ঘরকন্না। আবার পরৈকপ্রাণতা, পরার্থে আত্ম-সুখ-বিসর্জ্জন প্রভৃতি সকল গুণই সহানুভূতির একচেটিয়া।

সহানুভূতির প্রাণও বড় কোমল। নবনীতবৎ অল্প উত্তাপেই গলিয়া যায়। পরের চক্ষে অশ্রু দেখিলে কিছুতেই সে আপন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। সে তাহার প্রাণের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া, নীরবে তাহার অশ্রুর সহিত নিজের অশ্রু মিশাইবে এবং নীরবে আপন বক্ষ ভাসাইবে। পরে স্বকীয়

বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সাধ্যানুসারে তাহার অশ্রু মুছাইবে,—তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইবে। পরন্তু ইহার ঘৃণা, লজ্জা বা মানাপমান বোধ নাই। গলিত-কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তের কাছে যাইতে অপরে ঘৃণাবোধ করিবে, নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, দূর হইতে উঁকি মারিয়া সভয়ে সুদূরে পলায়ন করিবে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কাছ ছাড়িয়া যাইবে না, তাহার বেদনায় বেদনা বোধ করিবে, জননীর ন্যায় শুশ্রূষা করিবে, এবং প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিবে। আবার, যাহাকে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, সে তাহাকে প্রীতির নয়নে দেখিবে। যাহাকে অপরে তৃণবৎ পদদলিত করিতেছে, সে তাহাকে সাদরে গ্রহণ ও ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে। যে বিপন্ন, বুক দিয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবে। যে জাতি বা সমাজ রাজ-শাসন-দণ্ডের কঠোরাঘাতে সতত দণ্ডিত, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত, সে জাতি বা সমাজকে রক্ষা করিতে সে তাহার অতুল-ধন-সম্পত্তি, বিষয়-বিভব, অকাতরে বিসর্জ্জন দিবে, এবং প্রয়োজন হইলে আত্মবলি দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই সহানুভূতির ধর্ম্ম,—ইহাই সহানুভূতির কার্য্য।

সহানুভূতি বিলাসিতার উচ্চ মন্দিরে বসিয়া আপনার সুখে আপনি বিভোর থাকে না। সে আপনার সুখ, আপনার সম্পদ অকাতরে পরকে বিতরণ করিয়াই সুখী। আপনি সুখে থাকিব, আপনি ভাল খাইব, আপনি ভাল পরিব, এরূপ ভাবনা সে একবার স্বপ্নেও ভাবে না। আত্ম-সুখ-বিসর্জ্জন

দিয়া সেই সুখে পরকে সুখী করিতে পারিলেই সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। সে জানে, যাঁহারা সুখকে লক্ষ্য করিয়া সুখের জন্যই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই সুখী হইতে পারেন না। যাঁহারা সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ হইয়া, নিজের সুখ অন্বেষণ না করিয়া, পরকে সুখী করিবার জন্যই কার্য্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। *

সহানুভূতি এক মহৎ ব্রত। স্বার্থত্যাগ এ ব্রতের মূলমন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে মানব এ ব্রতে ব্রতী হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। বলিদান ইহার উদ্‌যাপন নহে, বলিদানই ইহার উদ্বোধন। স্বার্থমুগ্ধমানব কদাপি এ ব্রতের অধিকারী হইতে পারে না। আপনাকে লইয়া যিনি ব্যস্ত, আপনার চিন্তায় যিনি বিব্রত, আপনার গৃহপ্রাঙ্গনরূপ ক্ষুদ্র রাজ্য অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাঁহার যাতায়াত বা দৃষ্টিশক্তির চলাচল নাই, কদাপি তিনি ইহার ত্রিসীমায় আসিতে পারেন না। অয়স্কান্তমণি যেমন দূরবর্ত্তী লৌহখণ্ড গুলিকে স্বাভিমুখে টানিয়া আনে, স্বার্থের উপাসকও তেমনই পরকীয় পদার্থ নিচয়কে আত্মোদর পূর্ত্তির উপকরণরূপে আপনার আয়ত্ত

* Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness, on the happiness of others, on the improvement of mankind.

Auto-biography of
J. S. Mill.

করিয়া লয়। পরার্থপরতার ছায়াটীও তাহার অঙ্গ সংস্পর্শ করে না। সুতরাং তিনি এ ব্রতোদ্যাপনে মনঃসংযম করিবেন কিরূপে? সেসকল ক্ষুদ্রচিত্ত মানব, এ মহৎ ব্রতের মাহাত্ম্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিন্তু যিনি এই নশ্বর দেহের নশ্বরতা বুঝিয়া আত্ম-পর বিভেদ কল্পনা করেন না, এবং আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, কেবল তিনিই এ ব্রতের অধিকারী হইবার উপযুক্ত পাত্র। কেবল তিনিই মানব নামের গৌরব রক্ষা করিয়া মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন। একমাত্র সহানুভূতিই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতিই এ তপশ্চর্য্যার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন।

যিনি সহানুভূতির মন্ত্রশিষ্য বা সহানুভূতিই যাঁহার একমাত্র উপাস্যদেবী, তাঁহার হৃদয় প্রকৃতই প্রেমের উৎসবিশেষ। তাহা হইতে অবিরল দিগন্তপ্রসারিণী প্রেমধারা উত্থিত হইয়া সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির অন্তর্জীবনও তৎসংস্পর্শে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ ত কোন্ ছার? এ প্রেম গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরূপা ত্রিপথগামিনী ত্রিধারায় সতত প্রবাহিত। সেই ত্রিধারার একটীর নাম ভক্তি, একটীর নাম প্রীতি, অপরটীর নাম স্নেহ। প্রেম যখন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পূজাপাত্রের চরণ স্পর্শ করে, আমরা তখন তাহাকে ভক্তি বলি; প্রেম যখন অধোমুখে

ধাবিত হইয়া সোহাগপাত্রের শিরশ্চুম্বন করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলি; প্রেম যখন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্গত হইয়া প্রণয়পাত্রকে আলিঙ্গন করে, আমরা তখন তাহাকে প্রীতি বা ভালবাসা বলি। প্রেম লতার ন্যায় সহানুভূতির শত বাহু বিস্তার করিয়া সকল হৃদয়কে আলিঙ্গন করে, এবং আপনার স্নিগ্ধসুধা অপরের প্রাণে ঢালিয়া দেয়। চিকিৎসক যেরূপ বলহীনের শিরায় সবল ব্যক্তির শোণিত প্রবিষ্ট করাইয়া বলহীনের বলাধান করেন, সহানুভূতিও সেইরূপ আপনার হৃদয়নিহিত প্রেম-পীযূষ-ধারা দুর্ব্বল হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সতেজ করিয়া তুলে। কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে বিশিষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। একে, অন্যদীয় পদার্থে অপরের ক্ষতিপূরণ বা তেজোবর্দ্ধন করেন; অন্যে, আপনার দিয়া অপরের উপকার বা অভাব দূর করিয়া থাকে।

সহানুভূতির পূর্ণ-বিকাশ—আত্মত্যাগে। পরার্থে আত্মোৎসর্গই আত্মত্যাগ। সকলে এ ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন না, সুতরাং সকলেই ইহার মন্ত্রশিষ্য হইতে পারেন না। সহানুভূতির মন্ত্রশিষ্য হইতে হইলে তাঁহাকে আপনার শক্তি-সামর্থ্য, বিষয়বিভব, মানসম্ভ্রম যাহা কিছু তাঁহার আপনার বলিতে আছে, সমস্তই অম্লান বদনে পরকে সমর্পণ করিতে হইবে। এমন কি, তাঁহার দেহপ্রাণও সময়ের প্রয়োজনে তাঁহাকে পরার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। তবে তিনি তাহার শিষ্যরূপে আদৃত হইবেন। ত্রিপাদ-ভূমি-দান-ব্যপদেশে

বলি যেমন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া পাতালবাসী হইয়াছিলেন, বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবারণ জন্য কর্ণ যেমন একমাত্র প্রাণাধিক শিশুসন্তানের মাংস রন্ধন করিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন,—দধীচি যেমন পরোপকারের জন্য স্বকীয় অস্থিপঞ্জর দিয়া পরোপকাররূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, এবং শিবি যেমন শরণাপন্ন বিপন্ন পারাবতের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ দেহমাংস কর্ত্তন করিয়া গৃধ্রমুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেইরূপ সম্পূর্ণ আত্মত্যাগপরায়ণ হইতে হইবে। এরূপ ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত জগতের অন্যত্র বিরল হইলেও ভারতে বিরল নহে। ভারতীয় ইতিহাস ইহার রাশি রাশি জ্বলন্ত নিদর্শন বক্ষে লইয়া জগতে গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

এস্থলে আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইতিহাস হইতে সহানুভূতির কতকগুলি জ্বলন্ত-চিত্র পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১

আদি যুগের মধ্যসময়ে যখন বৈদিকক্রিয়াকলাপ ও যাগযজ্ঞবিধির অত্যুন্নত গরিমায় সমগ্র ভারতভূমি একমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছিল, যখন মুক্তি ও স্বর্গসুখকামনায় অগণিত-পশুপ্রাণ পাষাণ-প্রতিমার চরণতলে নিত্য নিত্য বলিদান হইতেছিল, মায়া নাই—মমতা নাই—চারিদিক যেন কেবল নির্ম্মম-নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল, নরবলি প্রথাও ধীরে ধীরে প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিল, সেই সময়ে সহানুভূতির মূর্ত্তিমান দেবতা 'মাভৈঃ—মাভৈঃ' রবে জগৎসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। শান্তির পবিত্র জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে বিভাসিত হইল। অত্যুদার গাম্ভীর্য্য-ধীরতার সহিত তিনি পরকে আপনার বক্ষে টানিলেন। স্নেহসকরুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"কেন ভাই, এ হিংসা কেন? এত ভেদাভেদ কেন? প্রাণীর প্রাণবধে দেবতার তুষ্টি হয় না,—আত্মস্বার্থে পরপ্রাণ বলিদানে আত্মসুখবৃদ্ধি হয় না,—আমরা সকলেই এক পিতার পুত্র,—একই স্রষ্টার সৃষ্টি,—সুতরাং আমরা পরস্পর সকলেই ভাই—ভাই। তবে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা—সকলের প্রতিই আমাদের সমান প্রেম, সমান স্নেহ, সমান দয়া, সমান

মমতা থাকিবেনা কেন? জীবনের এই আলোকময় পথে এস ভাই সকল! আজ আমরা আত্মপর ভুলিয়া—উচ্চনীচ ভুলিয়া—ভেদাভেদ ভুলিয়া—অযথা যুক্তিতর্ক ভুলিয়া—অখণ্ড সুন্দর সেই বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত হই, এবং পরম সুখ—বিমল শান্তি ও চরমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করি।”

যে মূর্ত্তিমান দেবতা আত্মসুখ, আত্মৈশ্বর্য্য ও আত্মরাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া সেই স্নেহকোমলা জননীর স্নেহগণ্ডী পার হইয়া, প্রেমময়ী পত্নীর সুদৃঢ় প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া, মায়ার পুত্তলি সুকুমার সদ্যজাত-শিশু-পুত্রের মায়ানিগড় ভগ্ন করিয়া, ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, জগতের ইতিহাসে সে পবিত্র নাম অসংখ্য উজ্জ্বল-মণি-মুক্তায় গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি কে? তিনি হিমালয়তলস্থ কপিলাবস্তুর একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজকুমার—শাক্যসিংহ। বুদ্ধাবতার নামে সুপ্রসিদ্ধ। *

বুদ্ধাবতারে তিনি জগৎ মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় এক অপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিলেন। সেই খরস্রোতে পশুপ্রাণ-হিংসা-স্রোত একটা ভীষণ বাধা প্রাপ্ত হইল। গর্ব্বিত-নির্ম্মম-বিকৃত-বৈদিক-আচার অসংখ্য জীবকঙ্কালের মধ্যে লজ্জায়, ক্ষোভে মুখ লুকাইবার স্থানান্বেষণ করিতে লাগিল। জগতের

* বুদ্ধদেব খৃষ্টের ৫৫৭ বৎসর পূর্ব্বে হিমালয় তলস্থ কপিলাবস্তু নগরে ইক্ষাকু বংশীয় নৃপতি শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অশীতি বৎসর বয়সে তিনি কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

এক তৃতীয়াংশ মানব এই পরম পূজ্য, পরমোদার ধর্ম্মের চরণাশ্রয়ে বিমলশান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইল।

বুদ্ধের কার্য্যশেষ হইল। তিনি বিশাল বাহুযুগলে বিরাট-বিশ্বকে আলিঙ্গনে দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অত্যদ্ভূত ত্যাগশীলতা, অসীম সহিষ্ণুতা ও অনন্ত বিশ্বপ্রেমের প্রোজ্জ্বল আদর্শ জগৎ-সম্মুখে সংস্থাপিত রাখিয়া, চিরমুক্তি ও চিরনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

জগৎ বুঝিল,—জগৎ জানিল, যে কি মহাভ্রমে নিপতিত হইয়া সে তাহার পরিণামশান্তি,—নির্ব্বাণমুক্তি অতল-বারিধি-গর্ভে নিমজ্জিত করিতেছিল। হৃদয়ের ভ্রমান্ধকার সুদূরে অপসারিত হইল। চারিদিকেই সুখের হিল্লোল উঠিল। যূপকাষ্ঠ উৎখাত হইল। পশুগণ নির্ভয়ে তৃণ ভোজন করিতে লাগিল। মূর্ত্তিমতী করুণা আসিয়া হিমগিরির গাত্র হইতে পশুশোণিত রূপ গৈরিককলঙ্ক বিধৌত করিল, এবং মানবহৃদয়ফলকে অমর অক্ষরে খোদিত রহিল,——

“অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।”

২

সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষের প্রখর করজালে এক সময়ে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ বিশুষ্ক ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গোপসাগরের শীতল সলিলকণা লইয়া একখানি শুভ্র মেঘ আসিয়া গগনতলে ভাসিল। সেই বিজলী-কিরণ-জাল-বিজড়িত নবজলধর খানি আপনার হৃদয়নিহিত প্রেম-বারি-ধারা ঢালিয়া বহুদিনের শুষ্ক তৃষিত ভূমি সিক্ত করিল,—তাপিত প্রাণ শীতল হইল। পরে চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদের মত উহার শিরায় শিরায় প্রেমধারা প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, অভাবের পূর্ণতা সাধিত হইল। অবশেষে উহা বন্যার স্রোতরূপে পরিণত হইয়া ভাগীরথির দুই কূল ভাসাইয়া অকূলে কূল দিল। তাই,—সেই বন্যার ভাষায় শুনিলাম,——

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু
ন'দে ভেসে যায়।"

সেই তীর-নিপ্লাবিনী স্রোতধারা বঙ্গদেশ ভাসাইল,—উৎকল ডুবাইল,—এবং কন্যাকুমারিকা বেষ্টন করিয়া উজান বহিল, শেষে কালিন্দীর কালজলে মিশাইল।

বঙ্গের সেই সুন্দর নবজলধর—**নবদ্বীপচন্দ্র—শ্রীগৌরাঙ্গ।***

জাতীয়-বিদ্বেষবহ্নি সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া যখন

* ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে ভাগীরথি তীরে বসবাস করিবার অভিলাষে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থান করেন। তিনি তথায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর

সমগ্র ভারত গ্রাস করিতেছিল,—মায়াবাদের বাদপ্রতিবাদে ও উষ্ণ বিচারে যখন মানবহৃদয় কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল,—যখন সমাজের কঠোর শাসনে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল,—একতার মধুর তার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তখন চৈতন্যদেবের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সহানুভূতি যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহার কানে কি মধুর মন্ত্র কহিয়া গেল। চৈতন্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন,—বহুতে 'এক' লীন করিতে না পারিলে, সেই বহু 'একত্বে' পরিণত হয় না। অথচ বহু, 'এক' না হইলেও আর দেশের মঙ্গল নাই। সেই লক্ষ্য সাধনের একমাত্র উপায়—বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগ। আবার আত্মস্মৃতি, বিস্মৃতিসলিলে ভাসাইয়া না দিলে, পরকে পরের জন্য চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আপনার ধনজনজীবন—পরকীয় ধনজনজীবনসহ বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে পরকে আপনার করা যায় না। চৈতন্যের

কন্যা শচী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর নামে তাঁহাদের দুই পুত্র জন্মে। দুই জনই ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বম্ভরই পরিশেষে চৈতন্য নামে বিখ্যাত হয়েন। চৈতন্য দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্নী বল্লভাচার্য্যের কন্যা সর্পদংশনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তিনি সনাতন রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। পত্নীর পূর্ণ যৌবনের সময় তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন; এবং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে নীলাচলে দেহত্যাগ করেন।

অন্তর-তরঙ্গায়িত এই গভীর চিন্তা-তরঙ্গিণী-রাজি পাষাণ-বক্ষ-বিদারিত-স্রোতস্বিনীবৎ শত ধারায় শতধা প্রবাহিত হইল। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া তিনি কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন

পরের জন্য তিনি আপনাকে ভুলিবেন,—স্নেহময়ী জননীকে ভুলিলেন,—প্রাণপ্রিয়তমা ভার্য্যাকে ভুলিলেন। গার্হস্থ্যবেশ পরিত্যাগ করিয়া, গৈরিক-বসন-পরিহিত হইয়া, তিনি নবীনসাজে নবীনযোগী সাজিলেন। মায়ের কান্না—পত্নীর রোদন—তাঁহাকে সংসারী করিতে পারিল না। পরার্থে তিনি গৃহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। হরিনামামৃত আকণ্ঠ পান করিয়া তিনি আপনি মাতিলেন,—নদীয়া মাতাইলেন। সম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা ভুলিয়া অসংখ্য নরনারী উন্মত্তের ন্যায় নদীয়ার স্রোতে ভাসিল। শুষ্কহৃদয় সরস হইল। পাপ-জীবন ধর্ম্মপ্রাণ হইল। গগনবক্ষে হরিধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল—ভাগীরথি কল কল নিনাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—নবমুঞ্জরিত-লতাপল্লব 'হরিবোল' হিল্লোলে আলোড়িত হইল,—সান্ধ্যগগন 'হরিবোল' হর্ষে নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—চন্দ্রমা-কিরণ যেন 'হরিবোল' জ্যোতির সুবিমল স্পর্শে অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—জগৎসংসার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। বিজাতীয়ঘৃণা—বিজাতীয়হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, যবন গাহিল 'হরিবোল!' আর সেই যবনঘৃণ্য নরকভীষণ মহা-নারকী জগাই মাধাইয়ের পষাণহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কে যেন

গাহিল—'হরিবোল! সেই 'হরিবোলের' মধুরমৃদঙ্গ তালে তালে বিশ্বসংসার মাতাইয়া তুলিল। বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্বপ্রেমধারা বিশ্বশিরায় ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বসংসার যেন অব্যক্ত অপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল।*

ফলতঃ তাঁহার সেই পবিত্র বিশ্বপ্রেমতরঙ্গের প্রত্যেক কণায় যেন ভগবানের পূর্ণ প্রতিবিম্ব বিম্বিত হইতে লাগিল। আর ইন্দ্রধনু যেন জ্বলন্তঅক্ষরে গগনভালে লিখিয়া দিল,—

"জীবে দয়া, নামে রুচি।"

৩

যিনি এই অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক, অনন্ত জীবজন্তু, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পরিপূর্ণ বিরাটব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া সকলের প্রতি সমপ্রেম, উদার অপক্ষপাত সুবিচার এবং কঠোর বিচারেও করুণার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে সর্ব্বজীবে সুখশান্তি প্রদান করিতেছেন, যিনি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুর আহার সংস্থান হইতে মানবের অতৃপ্ত-আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের প্রতিও উপেক্ষা করেন না, যাঁহার বিশাল ভাণ্ডার অভাব অপূর্ণতার কলুষিত-করস্পর্শে কলঙ্কিত হইতে পায় না এবং যাঁহার অক্ষুণ্ণ মহিমার চরণতলে মানবজগৎ সততই অপরিশোধ্যঋণে আবদ্ধ, সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টার আশীর্ব্বাদ অগ্রাহ্য করিয়া, য়ীহুদী জাতির হৃদয় যখন ধর্ম্মের বাহ্য আবরণের শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া অতি নীরস ও কঠোর হইয়া উঠিতেছিল, জাতীয় বিদ্বেষানলে যখন তাহাদের দেহপ্রাণ দগ্ধীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে তত্রত্য মরুভূমির জ্বলন্তভাপ নিবারণ জন্য, বিশ্বপ্রেমের শীতল, তরল, মধুর অমিয় পান করাইবার জন্য, জগতের বক্ষ হইতে হিংসাদ্বেষ, নির্ম্মমতার উচ্ছেদ সাধন জন্য, জগৎপিতার সহিত মানব সন্তানের যে মধুর স্নেহবন্ধন আছে, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করাইবার জন্য এবং দীনহীন পতিতজনের প্রতি তাঁহার যে অপার করুণা আছে, তাহা প্রচার করিতে, য়ীহুদাভূমিতে বিশ্ব-সত্তার অন্তরতমপ্রদেশ হইতে যে করুণার প্রস্রবণ প্রবাহিত

হইয়াছিল, তাহাই মানবদেহে ঈশা * (Christ) রূপে জগতে অবতীর্ণ।

ঈশা ঈশ্বরেরই তনয়। তাহা না হইলে অত ধৈর্য্য, অত বিনয় জগতে দেখিতে পাইতাম কি? যে সভ্যজগৎ আজ সেই মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পার্থিব উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াও আধ্যাত্মিক উন্নতির মায়া ভুলিতে পারেন নাই, তিনি এক মহাপ্রাণ -মহাপুরুষ বই কি? সেই মহাপুরুষ আত্মস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিয়া সহানুভূতির প্রিয় পুত্ররূপে সাদরে নরনারীর হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিশৃঙ্খল জগৎকে সমসূত্রে বাঁধিতে গেলে সহানুভূতির দৃঢ়বন্ধন প্রয়োজন। তাই—তিনি বিনয় সহকারে জগৎকে জানাইলেন, "মানব! আত্মায় আত্মায় এ বিরোধবৈষম্য কেন? তোমারও যে শোণিতে, প্রকরণে, যে সুখে দুঃখে এমন সুন্দর দেহ টুকু গঠিত হইয়াছে, উহারও কি তেমনই নহে? তবে উহার প্রতি তোমার আত্মভাব না জন্মাইয়া দ্বেষ বা হিংসা জন্মিবে কেন? যদি আত্মার পবিত্র সুখ ও বিমল শান্তি উপভোগ করিতে চাও,—তবে অবিচলিত-বিশ্বাসে বিশ্বস্রষ্টায় ভক্তি স্থাপন কর,—জগৎ হইতে বৈষম্যবাদ উঠাইয়া দাও,—পরকে আপনার কর। আর এই প্রলোভন-

* জুডিয়া দেশের অন্তর্গত জেরুশালমের সন্নিহিত বেথলহ্যাম নগরে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। দাউদের পুত্র সুবেকী জোসেফ্ াহার জনক ও পতিপ্রাণা শুদ্ধচারিণী মেরী তাঁহার জননী ছিলেন।

ময় জীবনে দুর্ব্বল মানবের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সৎপথে থাকা অতি দুরূহ; আপনার পুণ্যবলে শান্তি যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন তাঁহার মধুর প্রেমে বিশ্বাস কর। তাঁহার অনুগ্রহে পাপভারাক্রান্ত জীবনেও শান্তি পাইবে।”

কিন্তু তাঁহার এই ঐকান্তিকী প্রার্থনাও ব্যর্থ হইল। মানুষ যখন পাপে চিরাভ্যস্ত হইয়া উঠে, হিতকথা তখন তাহার প্রিয় বোধ হয় না। য়ীহুদিদিগের ঠিক সেই দশা হইয়াছিল। য়াহুদিদিগের নিকট তাঁহার সেই অসীম মমতাও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিল।

যখন চিরজীবনব্যাপী ঘৃণা ও অপমান সহ্য করিয়া সামান্য দস্যুর ন্যায় তাঁহার সেই মহাজীবন ক্রুশবিদ্ধ হইবার জন্য বধ্যভূমিতে সমানীত হইল, তখন সেই সুকোমল হৃদয়ে আত্মদুঃখ, আত্মপীড়া রহিল না। তখনও তিনি সেই সমবেত জিঘাংসু য়ীহুদিদিগের অসংযত উল্লাসের অন্তরালে তাহাদের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ দৈন্য, সহানুভূতির নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন-মরণের সঙ্গম স্থলে দাঁড়াইয়াও, অক্ষুব্ধ ধীরতায় বিনম্র বিনয়ে বলিয়া উঠিলেন,—

“Father, forgive them for they know not, what they do.”

পিতঃ, ইহাদিগকে মার্জ্জনা কর, ইহারা বুঝিতে পারিতেছেনা যে, ইহারা কি গর্হিত কার্য্য করিতেছে।

প্রাবৃটের ঘনীভূত জলধর যেমন আপনার পরিপূর্ণ দেহ খানি বিনষ্ট করিয়া পরোপকারার্থে জগতীতল জলধারায়

ভাসাইয়া দেয়, মহাপ্রাণ ঈশাও তেমনই ক্রুশে আত্মজীবন বলি দিয়া জগতের নির্ম্মমঅন্তরে যে প্রেমধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ সমগ্র য়ুরোপ পরমোপকার ও চরমশান্তি লাভ করিয়া প্রাবৃটান্তে হেমন্তের স্বর্ণহাস্যের ন্যায় হাসিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহারই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ আজিও যে সমস্ত বিভীষিকাময়ী যাতনা, কঠোর আত্মপীড়া সহ্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার অসভ্য, অশিক্ষিত নরমাংসভোজী ব্যক্তি-বর্গকে সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যেরা নিজ হস্তে তাহাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইতেছেন, কৃষিকার্য্য শিখাইতেছেন, লেখাপড়া শিখাইতে-ছেন, এবং এই সমস্ত শিক্ষা দিবার সময় তাঁহারা কত বাধাবিপত্তি, দুঃখক্লেশ, ঘৃণাতাচ্ছিল্য, এমন কি গুরুতর প্রহার পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেছেন, তাহা প্রকৃতই সেই মহামহিমাময় উচ্চাদর্শের আদর্শ বলিতে হইবে।

আদিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এইরূপ কত শত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যে সাহারার প্রতপ্তবক্ষে অনাহারে—অনিদ্রায়—আত্মজীবন ত্যাগ করিয়াছেন,—ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে রণাহতের সেবাশুশ্রূষা করিতে করিতে আত্মজীবন নষ্ট করি-য়াছেন, ইতিহাস তাহার সংখ্যাও রাখিতে পারে নাই।

৪

যখন ঘোর নাস্তিকতা, কুসংস্কার কতর্ক উচ্ছৃঙ্খল আচার ব্যবহার, যথেচ্ছ ব্যভিচার সুদূর আরবক্ষেত্রের গৃহে গৃহে সাহারা মরুভূর মত মায়াহীন প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল,—পাপের নাম যখন আরবের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিতেছিল,—হননোদ্যত মাতৃক্রোড়স্থ শিশুকন্যার সকরুণ রোদনে যখন 'লু' এরও উষ্ণশ্বাস স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল,—যথেচ্ছ বিবাহ প্রথায় দিন দিন যখন সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল,—রোগ, শোক, ক্ষোভ, হাহাকার যখন আরবের শোণিতরাশি বিষাক্ত করিতেছিল,—একটি জাতি যখন সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মনুষ্য যখন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য সতত লালায়িত,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিজাতীয় নির্ম্মমতা যখন খরস্রোতে প্রবাহিতা,—কুসংস্কারান্ধ উন্মত্ত আরব যখন উলঙ্গবেশে 'কাবাগৃহের' (উপাসনামন্দিরের) চতুর্দ্দিকে প্রেতযোনীর ন্যায় নৃত্যশীল, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া যখন আরব জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর উপাসনা-নিরত, তখন সেই বিপ্লববিধ্বস্ত, অস্থিকঙ্কালসার আরবকে একধর্ম্ম একপ্রাণ, একজাতি, একসমাজ ও একই মহৎ ব্যবসায়ে ব্রতী করিবার মানসে আরবের কঙ্কালসারদেহে প্রাণ, শোণিত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্পৃহা সঞ্জাত করিবার জন্য যিনি অগ্রসর হইলেন,

তিনিই জগন্মান্য-মহাপ্রাণ মহম্মদ।* তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম—**ইস্লামধর্ম্ম**, ধর্ম্মগ্রন্থ—**কোরাণ** নামে অভিহিত।

এই ধর্ম্মের মূলভিত্তি একেশ্বরবাদ ও সাম্য। নীচ হউক, দীন হউক, যে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সে উপযুক্ত হইলে সমাজের সর্ব্বোচ্চ আসন হইতেও বঞ্চিত হইবে না। শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব বাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে,—জগতের মধ্যে যদি কোন জাতি যথার্থ সাম্যভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ত, সে মুসলমান। খ্রীষ্টানপ্রভু তাঁহার ক্রীতদাস টমের বুকের মাংস সাঁড়াশী দ্বারা ছিন্ন করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু মুসলমানের ক্রীতদাস—সবক্তগীন্, কুতব, আল্টামাস প্রভুকন্যার পাণিগ্রহণ ও ভবিষ্যতে রাজ্য লাভেও বঞ্চিত হয়েন নাই।

মহম্মদকে সকল সময়ের সকল দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা একমাত্র সহানুভূতিবলেই স্বজাতিকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধ, চৈতন্যের ন্যায় নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন না। অশিক্ষিত কঠিন হৃদয়কে কিরূপে স্পর্শ করিলে

* মহম্মদ ইস্মাইল বংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা। ধনীর সন্তান হইলেও তিনি পিতার ঐশ্বর্য্যসুখে মত্ত থাকিতেন না। দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি সামান্য মেষ-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তদুপার্জ্জিত সামান্য আয়ে অতি দীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ৫৭০ খৃঃ অব্দে তিনি মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হয়, তাহা তিনি শিক্ষা করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই। বুদ্ধ ও চৈতন্য প্রথম যে জগতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, সে জগৎ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কল্যাণে উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ ও তৎসাময়িক আরবীয়দিগের উপর ঐরূপ কোন উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা, প্রভাব বিস্তার করে নাই। বহুদিন ব্যাপী সাহিত্যসেবায় পরিমার্জ্জিত একটি ভাষা, তিনি আপন ধর্ম্মপ্রচারের ভাষারূপে প্রাপ্ত হয়েন নাই; এবং দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের অনুরূপ পরিমার্জ্জিত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারপদ্ধতি ও এই জন্য একটু বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। তিনি আরবীয়দিগকে স্বপদে কুঠারাঘাত হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলপ্রয়োগও দূষ্য বিবেচনা করেন নাই। এইরূপ একটি বিষয়ে এড্মাণ্ড্ বার্ক্ তাঁহার রিভলিউসন্ ইন্ ফ্রান্স্ নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,

"Government is a contrivance of human wisdom to provide for human wants. Men have a right that these wants should be provided for by this wisdom. Among these wants is to be reckoned the want, out of civil society, of a sufficient restraint upon their passions. Society requires not only that the passions of individuals should be subjected, but that even in the mass

and body as well as in the individuals, the inclinations of men should frequently be thwarted, their will controlled, and their passions brought into subjection. * * *

* * * * *

In this sense the restraints on men, as well as their liberties, are to be reckoned among their rights."

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ এই :—

যিনি কোন জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই জাতির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে বাধ্য। তিনি যেমন উহার অন্নবস্ত্র, সুখসৌষ্ঠব, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং কেহ ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, হিংসা বা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যাচারপরায়ণ হইলে তাহাকে দণ্ডিত করিবেন, তেমনই সমাজের মধ্যে যদি কোন দল, কোন বিষয়ে আপনাদের উপকার হইতে এরূপ ভ্রমে হিতাহিত জ্ঞানহীন হইয়া প্রকৃতই সমাজের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আপন রাজশক্তির প্রয়োগে তাহাদিগকে দমন ও আসন্নবিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

মহম্মদও যেন কতকটা এইরূপই বুঝিয়াছিলেন। আরবের দুঃখে তাঁহার প্রাণে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহার আশু প্রতিবিধানের জন্য তিনি এত অধীর

হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যেন কে তাঁহার অন্তরাত্মাকে সতত উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ধর্ম্মের মন্দিরে সকলই বলি দেওয়া যায়,—বলপ্রয়োগও দোষাবহ নহে।

মহম্মদ আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই সুপ্তবীর্য্য-জাতিকে যদি একবার প্রকৃত ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহার পক্ষে হিমাদ্রি সমূলে উৎপাটিত করাও অসাধ্য হইবে না। প্রকৃত হইয়াছিলও তাহাই। এক দিন এই জাতির দুর্দ্দমনীয় তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বীর্য্যবান রাজপুতকেও ইহাদের চরণতলে রাজমুকুট নিপাতিত করিতে হইয়াছিল। এক দিন ভারতের প্রতিলোমকূপ মহম্মদীয় বীর্য্যে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদীয় সম্রাটের এক-ছত্রতলে এক দিন অগণিত রাজরাজ্য—একাকার হইয়া গিয়াছিল। এক দিন য়ুরোপের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী স্পেন দেশ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের শূন্য সিংহাসনের পার্শ্ব পর্য্যন্ত, মুসলমানের চন্দ্রার্দ্ধ-লাঞ্ছিত-বিজয়-পতাকা মহম্মদীয় ধর্ম্মোদ্ভূত পার্থিব গৌরবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; আর পারমার্থিক গৌরব আজ বিংশতি কোটি মানবের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণে দেদীপ্যমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বচ্ছ-নির্ম্মল-মণিতেই প্রতিবিম্ব পড়ে,——মৃত্তিকায় পড়ে না। তেমনই উদারহৃদয় ভিন্ন সহানুভূতির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ফুল চিরদিনই ফুটে—আবার শুকায়, মানব চিরকালই হাসে—কাঁদে, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করেন; কিন্তু কয় জন উহাদের আত্মা, প্রাণমন দিয়া অনুভব করেন এবং সেই অনুভূতি কল্পনা সংমিশ্রণে লোক-সমক্ষে ধরিয়া দেন? সংসারে আসিয়া সকল মানবই পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, শোকসান্ত্বনায় ওতপ্রোত; কিন্তু কয় জন আত্মসুখ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া বেশ সূক্ষ্মসহানুভূতির চক্ষে উহাদিগকে অনুভব করেন? যিনি করেন,—যিনি আপনার বিদ্যাবুদ্ধি, ধ্যানধারণা, প্রতিভা অনুরাগ সমস্ত সেই সূক্ষ্মতম সহানুভূতির সহিত মিশাইয়া উহাদিগকে শরীরী করিয়া তুলেন, তিনিই প্রকৃত কবি।

কবির সৃষ্টি সহানুভূতি মূলক। সেই সহানুভূতির সাধনা বলেই কবি, লোকচরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সহানুভূতি না থাকিলে কবিহৃদয় প্রস্ফুটিত হয় না। সহানুভূতিই কবির প্রাণ।

এই সহানুভূতির প্রথম অনুশীলন ও শিক্ষা বাস্তব জগতে জীবন্ত আদর্শসন্দর্শনে। পরিবারস্থ, গ্রামস্থ ও

সমাজস্থ লোকের সংস্পর্শে সকলকেই আসিতে হয়। তবে কাহাকেও বা অল্প, কাহাকেও বা অধিক পরিমাণে, ইহাই বিশেষ। এই সংস্পর্শে কবির সহানুভূতির অনুশীলন ও শিক্ষা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই হইতে থাকে। তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে যেরূপ, কবির পক্ষেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার চরিত্র ও মানসিক অবস্থানুযায়ী সহানুভূতি অপর বিষয় অপেক্ষা দুই চারিটি সাময়িক বা সাম্প্রদায়িক বিষয়ে হয়ত প্রবলতর হয়। এই সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি তৎসাময়িক ও তদ্দেশীয় লোকের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু অপর দেশীয় লোকের নিকট কিম্বা কিছুদিন পরে ঐ দেশীয় লোকের নিকটই উহাদের উপযোগিতা অতি অল্প বিবেচিত হইতে পারে। যিনি এই সাময়িক ও সাম্প্রদায়িক ভাবগুলি দ্বারা অযথা পরিচালিত না হইয়া, মানবচরিত্রের চিরন্তন রহস্যগুলির প্রতি আপনার সহানুভূতি অবিচলিত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই কবি-সমাজের সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী। অনেক উচ্চ শ্রেণীর কবিও এইরূপ কোন না কোন সাময়িক ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মিল্টনের পিউরিটান ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম ও আনন্দমঠের এবং নবীনবাবুর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের চরিত্র মধ্যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সাময়িক ও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার প্রয়োগ ইহার উদাহরণ স্বরূপ। যদি কেহ আপনাকে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সাময়িক ও সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তবে সে—সেক্স্পীয়র।

এক্ষণে কবির চরিত্রসৃষ্টিতে জীবন্ত আদর্শের কত দূর প্রভাব, তাহা দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহানুভূতি কল্পনাশক্তির ফল। কল্পনা ভিন্ন সহানুভূতি নাই। কিন্তু যে স্থলে কবি শুদ্ধ কল্পনার তুলিকায় লোকচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান, সে স্থলে তাঁহার সে প্রয়াস চিত্তোন্মাদকর ফল প্রসব নাও করিতে পারে। কারণ তথায় জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি সেখানে নাই। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া লোকচরিত্র অঙ্কিত করিলে তাহা হইতে সুফল প্রসূত হইবে, স্বাভাবিকত্ব স্ফুরিত হইবে। যিনি সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতির সংমিশ্রণে সৃষ্টির বৈচিত্র্য অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। সাধক যেমন তাঁহার উপাস্যদেবতার প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সাকার রূপে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানধারণা করিয়া থাকেন, কবিকেও সেইরূপ জীবন্ত প্রতিরূপ দেখিয়া লোকচরিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তবে তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন, নতুবা তাহার প্রাণদানই হইবে না। প্রাণদান না হইলে সে মূর্ত্তি মৃতপিণ্ডবৎ জড়পদার্থ নয় ত কি? এই প্রাণদানশক্তি এক সহানুভূতি ভিন্ন আর কাহারও নাই। ফলতঃ প্রত্যেক কবিরই এ সহানুভূতি থাকা চাই। তাহা না হইলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে এ সহানুভূতি

ছিল, তাই তিনি অমন একটা দিগ্‌গজ কি প্রতাপ,—একটা আয়েসা কি জেব্‌-উন্নিসা,—একটা কুন্দ কি শ্রী লিখিতে পারিয়াছিলেন। মাইকেলে তাহা ছিল, তাই তিনি রাক্ষস-কুলে এমন সতী সাধ্বী মূর্ত্তিমতী সহানুভূতি সরমা আর সাগর-গর্ভনিহিতা পাশি-প্রণয়িনী-সখী চটুলা মুরলা মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর হৃদয়ে এ সহানুভূতি ছিল, তাই তিনি অমন একটা নিমচাঁদ কি ঘটিরাম,—একটা তোরাপ কি রাইচরণ লিখিতে পারিয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্রের হৃদয়েও সহানুভূতি বড় প্রবলা। খরস্রোতা মন্দাকিনীর ন্যায় তাহা সতত তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিতা। তিনি তাঁহার কুরুক্ষেত্র কাব্যে আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রপ্রান্তরে অভিমন্যুর নিয়তি পূর্ণ হইলে, পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া সুভদ্রার্জ্জুন, বীরপুত্রশোকে বিন্দুমাত্র বিকলচিত্ত না হইয়া, যে ভাবে তাঁহারা বিশ্বময় পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, কবি—কবিতার ভাষায় আজি তাহা বিশদরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সুভদ্রা বলিতেছেন,—

"সমগ্র-মানবজাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক নর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি,—
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত-অমর।"

আবার অর্জ্জুন,—

"চাহি দূর শূন্যপানে, অস্ফুট অস্ফুট যেন,
দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত-অমর,
ছুটিল হৃদয়ে নব প্রীতির নির্ঝর।"
(কুরুক্ষেত্র কাব্য)

আমরা এমন বর্ণনা খুব কমই শুনিয়াছি। উদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ের প্রতি অক্ষরে যেন কবি তাঁহার আপনার হৃদয়ের ছায়া সুস্পষ্ট আঁকিয়া রাখিয়াছেন। আমরা জানি, কবি স্বয়ং জনৈক পুত্রহারা পিতা। পুত্রহারা হইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবের উৎস উঠিয়াছিল, কবিতায় তাহা ফুটিয়াছে। পুত্রহারা দম্পতির মুখ দিয়া তিনি তাহা কহিয়াছেন; এমনই ভাবে করিয়াছেন যে, ঠিকই যেন তাঁহার অন্তর-নিহিত-চিত্রের অবিকল প্রতিবিম্বটি, সুভদ্রার্জ্জুনের যুগল-চিত্র-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে। জীবন্ত-প্রতিরূপ সন্দর্শন জন্য কবিকে আর দূরে যাইতে হয় নাই। আদর্শ আপনার অন্তরময় হইয়াই বিরাজমান ছিল। যেখানে চাহিয়াছেন, সেই খানেই আদর্শ দেখিতে পাইয়াছেন। হৃদয়ে সহানুভূতির প্রবল আধিপত্য না থাকিলে এমন হয় কি?

সুভদ্রার্জ্জুনের বিশ্বময় পুত্রমুখ সন্দর্শনরূপ ভাব দেখিয়া স্বতঃই আমাদের মনে হয়, কবি একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানদর্শী মহাপুরুষ। ইচ্ছাময়ের সকল ইচ্ছাই যে শুভফল প্রসবিনী, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি

পুত্রশোকে বিকলচিত্ত না হইয়া আনন্দময়ের রাজ্যে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সহানুভূতি—জোর করিয়া তাঁহার অন্তরের সে ভাব লেখনীমুখে বাহির করিয়া লইয়াছে।

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শুদ্ধ কল্পনাবলে কবি লোকচরিত্রের নিখুঁত-ফটো তুলিতে পারিবেন না। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে থাকা চাই।

আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া বলি। যেমন আকাশের তারাটি, গাছের ফুলটি, বনের পাখীটি, এসকল লেখনীর মুখে বাহির করা কবির স্থির-কল্পনা-সাপেক্ষ, তেমনই দুঃখীর নয়নাশ্রু, বিলাসীর বিলাস-বিভ্রম, রমণীর বিলোল-কটাক্ষ-বিস্ফুরণ, সকলই সুকবির সূক্ষ্ম তুলিকার কৌশলময়ী সৃষ্টি। আবার বৃক্ষারূঢ় মর্কটটা, গুরুভারবাহী নির্ব্বোধ বলদটা বা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর-বিস্ফারিতনাসা শুষ্ককণ্ঠ ট্রাম্‌ওয়ের ঘোড়াটা এসকলের অবিকল চিত্র অঙ্কনও কবির স্বাভাবিকী কল্পনাশক্তির ফল। রমণীর মুখই বল, আর চাঁদের হাসিই বল অথবা বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসই বল বা প্রণয়পাত্রাভিলাষিণী অভিসারিকার কালপ্রতীক্ষাই বল, সকল ছাঁচ তোলাই কবির হস্তকুশলতার ফল। কিন্তু কবির এ মনোমুগ্ধকরী শক্তির মূল কি? দেখিলে দেখিতে পাইবে, মূল সেই জীবন্ত আদর্শসন্দর্শন।

সহানুভূতি লজ্জার অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদিত করিয়া পরিজন-পরিবেষ্টিত-নবোঢ়া-বধূবৎ গৃহের এককোণে নীরবে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। সে অনাবৃতদেহে বিশ্বরাজ্যের

বহিঃপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেই সতত অভিলাষিণী। তাই সে যেখানে যাহা দেখিতে পায়, কবির কলমের আগায় বসিয়া সে তাহার অবিকলচিত্র চিত্রিত করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়া থাকে। যাহার যে অংশটুকু যে ভাবে ব্যবস্থিত, সে তাহা তদনুরূপ আঁকিবে। বিন্দুমাত্র বাদ সাদ দেয় না। ভানুমতীর রূপ বর্ণনাচ্ছলে সে তাহার উরুদেশস্থিত তিলটি পর্য্যন্ত নির্ভয়চিত্তে আঁকিয়া বসে। প্রাণদণ্ডের ভয় রাখে না। পদী ময়রাণীর মিঠাই বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার নত নাড়াটুকু পর্য্যন্ত আপনার সুকোমল তুলিকায় তুলিয়া লয়। আবার সরসী-নীর-শোভিত-সুন্দর-কমলটী আঁকিতে গিয়া, মধুপানমত্ত-অলিটির পুচ্ছ পাখা পর্য্যন্ত আঁকিয়া ফেলে। এক চুল এদিক ওদিক হয় না। এমনই হস্তকৌশল-নিপুণতা আর ক্ষিপ্রহস্ততা। শিবিকাবাহী উড়ে বেহারাদল যে অব্যক্ত ভাষায় পথ-পর্য্যটন-ক্লান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে, রামার মা রূপার পৈঁছা পরিবার লালসায় অকারণে কোলের ছেলে ঠেঙ্গাইয়া বৃদ্ধস্বামী রামধন মণ্ডলকে যে কর্কশ ভাষায় আপ্যায়িত করে,—বাতাসের গলায় দড়ি বাঁধিয়া গোবরার মা প্রতিবাসিনী রাধুবাগদিনীর সঙ্গে যে অশ্রাব্যভাষায় কোন্দল করিয়া থাকে, সে ভাষাটুকু শুদ্ধ সুরঙ্গে ফলাইতে সহানুভূতি ভুলিয়া যায় না। বরং সোৎসাহে আঁকিয়া লয়, তিলটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লয়। জীবন্ত-প্রতিরূপ সম্মুখে না থাকিলে, সাধ্য কি সহানুভূতি কবির ঘাড়ে চাপিয়া এমন করে?

জীবন্তআদর্শ হইতে কবি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সেই অভিজ্ঞতা যখন কবির কল্পনার সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়া কেবল মাত্র কল্পনারই অপূর্ণতা পূরণে বা উদ্দাম চাঞ্চল্য নিবারণে ব্যাপৃত থাকে, সেই খানেই চরিত্রসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। এই অভিজ্ঞতা না থাকিলে কবি অকস্মাৎ কল্পনারাজ্যের কোন অসম্ভব বা অপরিচিত প্রদেশে উপনীত হইতে পারেন।

কবিকে কোন নির্দ্দিষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চরিত্র-প্রণয়নে নিযুক্ত হইতে হইলে চলিবে না। আমার নির্দ্দিষ্ট ধারণার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যাহা সম্ভবদৃশ্য, তাহাই দেখিব ও চেষ্টা করিয়া জনসমাজ সমক্ষে উপনীত করিব, আমার ধারণার অতীত বিষয়গুলি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব না, এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব উচ্চ শ্রেণীর কবির স্পৃহনীয় নহে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে সংসারের সাধারণ চলিত নীতিগুলি পালন করিয়া সততার সহিত জীবন কাটাইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতার অভাব থাকিলেও লোকে তাঁহাকে মার্জ্জনা করে। সততা থাকিলেই যথেষ্ট হইল, লোকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কবির যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার অভাব কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে। এই কার্য্যটি পাপ, এইটি পুণ্য, এইরূপ মোটামুটি বিচারই পারিবারিক জীবনে অনেক সময়ে যথেষ্ট, কিন্তু কবির পক্ষে তাহা তাঁহার হৃদয়ের দীনতার পরিচায়ক। কবি যখন এইরূপ একটি

ধারণা লইয়া বসেন, আমি এই চরিত্রটিকে ধার্ম্মিক চিত্রিত করিব, সুতরাং ইহাকে এই সমস্ত মহৎকার্য্য করিতে হইবে। এই চরিত্রটিকে পাপী চিত্রিত করিব, সুতরাং ইহাকে এই সকল পাপ কার্য্য করিতে হইবে, তখন তাঁহাকে সাধারণ যাত্রার দলে অভিনীত নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকার্য্যরত মহাত্মা ও নিরবচ্ছিন্ন পাপাচারী দুরাত্মাপূর্ণ নাটকপ্রণেতার স্তায় হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

যে সমস্ত বাহ্যপরিচ্ছদ ও কার্য্যপরম্পরা মানুষের অন্তরস্থ প্রবৃত্তিনিচয়ের ক্রিয়া অপরের নিকট হইতে, এমন কি তাহার নিজের নিকট হইতেও লুকাইয়া রাখে, চরিত্র সৃষ্টিকর কবির, সেই সকল বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরস্থ জটিল হৃদয়যন্ত্রের কার্য্যপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। কবির সহানুভূতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিকে এইরূপে প্রয়োগ করিতে পারে, ততক্ষণই তৎসৃষ্ট চরিত্রের সজীবতা সম্ভব। যেখানেই কবি কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আপন সহানুভূতিতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিকে অযথা সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলেন, সেইখানেই তৎসৃষ্ট চরিত্রের বাহ্য পরিচ্ছদ ও আবরণ মাত্র অঙ্কনে কৃতকার্য্য হয়েন। তাহার অন্তরপ্রকৃতি তাঁহার নিকটও যেরূপ অন্ধকারে, পাঠকের নেত্রেও সেইরূপ অন্ধকারে থাকিয়া যায়। ইংরাজি সাহিত্যে চরিত্রঅঙ্কন সম্বন্ধে সেক্‌স্পীয়রের নিম্নেই সার ওয়াল্টার স্কটের স্থান; সেক্‌স্পীয়র অপেক্ষা তিনি অনেকাংশে হীন হইলেও ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, মানবচরিত্রের রহস্য সম্বন্ধে

তাঁহার অভিজ্ঞতা বড় সামান্য ছিল না। তিনি পুরুষজাতির ও নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীজাতির চরিত্র অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট করিতে পারিতেন, কিন্তু মধ্যযুগে য়ুরোপীয় যোদ্ধা ও ভদ্র-লোকদিগের হৃদয়ে Chivalry (বীরধর্ম্ম) স্ত্রীজাতির প্রতি যে গভীর ভক্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, স্কট্ তাঁহার প্রভাব হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতে পারেন নাই। তিনি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীজাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; উপন্যাসে তাহাদের পরিচ্ছদ মাত্র চিত্রিত করিয়াছেন ও তাহা-দের মুখ দিয়া দুই চারিটি সামাজিক শিষ্টালাপের কথা মাত্র বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে তিনি সাহস করিতেন না। তাঁহার অঙ্কিত উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্র গুলি এই জন্য এমন নির্জীব, অথচ সুন্দর-সুবেশপরিহিত পুত্তলিকা বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ঐতি-হাসিক স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এ কথাটি তত খাটে না। সেখানে কবি ইতিহাস হইতে তাহার অন্তরপ্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য দুই একটি কথা যাহা কিছু জানিতে পারেন, তাহার সমীচীন ব্যবহারেই আপন অভাব পূরণ করিয়া লয়েন। তাঁহার Abbot উপন্যাসে স্কট্‌লণ্ডরাজ্ঞী মেরীর চরিত্র এজন্য এমন সজীব ও সুপরিস্ফুট।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সহানুভূতি কেবল শোক দুঃখেরই সহচরী নহে। সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, হিংসাঘৃণা প্রভৃতি সকল প্রবৃত্তিকেই ইহা কোমলকরস্পর্শে অনুভব করে। বাস্তবিক

মানুষের দুঃখ অনেক সময় রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-নিচয়ের ঘাত প্রতিঘাতের ফল। সেক্স্পীয়র কেবলই হ্যাম্‌লেটের মহাদুঃখ ও অত্যাচার-প্রপীড়িত পিতা লীয়রের অসহ্য যন্ত্রণা ও তৎপ্রসূত মস্তিষ্কবিকার চিত্রিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি ইয়াগোর প্রতিহিংসা, ওথেলোর ঘনীভূত সন্দেহ, কোরাইওলেনাসের ক্রোধ ও স্বজাতিদ্বেষ, টাইমনের মনুষ্যজাতির প্রতি অবিচলিত বিরাগ, ম্যাক্‌বেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পাপপঙ্কে আকণ্ঠ-নিমজ্জন এবং ব্যাঙ্কোর নিষ্পাপ হৃদয়ের নিরাময় স্ফূর্ত্তিও অঙ্কিত করিয়াছেন। মহাভারতের দুর্য্যোধন ও বিষবৃক্ষের হীরা, আমাদের উক্তির পরিপোষক আর দুইটি উদাহরণ।

কবির ন্যায় চিত্রকরের হৃদয়েও সহানুভূতি বড় প্রবল। যে শোণিত কবির প্রাণ, কবির উপাদান, চিত্রকরেরও তাহাই। কবি যেমন চরিত্রসৃষ্টিরূপ সমুদ্রের কূল-সন্নিধানে আসিয়া সহানুভূতি অভাবে সলিল স্পর্শেই অকৃতকার্য্য হয়েন, চিত্রকরও তেমনই সহানুভূতিহীন হইলে তাঁহার চিত্রে কতকগুলি বর্ণ সমাবেশ দেখা যায় মাত্র। বর্ণের অভ্যন্তরে যে একটি প্রাণময়ী সৌন্দর্য্যশ্রী লুক্কায়িত থাকে, তাহা তিনি উপলব্ধি করাইতে অক্ষম হয়েন। কবি—হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করেন, আমরা তাহা হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হই। চিত্রকর সেই হৃদয়টিকে হস্তপদ, পোষাকপরিচ্ছদে, সুসজ্জিত শরীরী করিয়া লোকনেত্রে উপহার দেন; আমরা তাহা চর্ম্মচক্ষে দর্শন করি—

কৃতার্থ হই। সংসারসরসীবক্ষে একই মৃণালবদ্ধ যুগ্মকমলের ন্যায় কল্পনাহিল্লোলে উভয়েই দোদুল্যমান। মূলমন্ত্র উভয়েরই এক। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—আকাঙ্ক্ষা এক, বাহ্যক্রিয়া মাত্র বিভিন্ন। সেই মন্ত্রবলে উভয়ে উভয়ের কাম্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। একজন—লেখনী করে, অপর—তুলিকা হস্তে; একজন—শব্দগ্রন্থনে, অপর—বর্ণ বৈচিত্রে।

চিত্রকরের কবিতুল্য প্রতিভা, সহানুভূতি, কল্পনা ও সর্ব্বোপরি একাগ্র পর্য্যবেক্ষণ থাকা প্রয়োজন। জীবন্ত আদর্শের সহিত কল্পনার সম্মিলনে চিত্রও কাব্যের তুল্য আদরণীয় হইয়া উঠে এবং কবিসৃষ্টির পার্শ্বে রক্ষণোপযোগী হইয়া সমান মহিমা ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া থাকে।

কবি, একাধারে যুগপৎ কবি ও চিত্রকরের কার্য্য করিয়াছেন এমন কালিদাসে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নয়। চিত্রকর তাঁহার চিত্রের আপাদমস্তক নায় কেশাগ্রটি পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অঙ্গ যে ভাবে ব্যবস্থিত, ঠিক তদনুরূপ আঁকিলেন এবং তদুপরি চিত্রের হৃদয়টি মুখে প্রতিবিম্বিত করিলেন। কবি তাহার হস্তপদ, বেশভূষা কিছুই আঁকিলেন না; পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইবার ভার দিলেন। কেবল এমন একটি অঙ্গভঙ্গী বা কার্য্য দেখাইলেন, যাহাতে তাহার অন্তরপ্রকৃতি হইতে মুখের ভাব এবং অন্যান্য কার্য্যপরম্পরা সকলই বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কালিদাসে যেখানে :—

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বু পায়িনাম্॥"

মুনিকন্যারা আলবালে জল সেচন করিয়া জলপানার্থী পক্ষি-দিগের বিশ্বাসের জন্য একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে সেই 'তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্' কথাটির অন্তরালে একটি গৈরিক বসনপরিহিতা কুশবলয়ালঙ্কৃতা সরলার স্নেহময় কৌতূহলোদ্দীপ্ত-মুখ বৃক্ষপত্ররাজির মধ্য হইতে পাঠকের নয়নে ভাসিয়া উঠিল। আর একস্থলে,—ইন্দুমতী যখন অন্তঃপুর হইতে স্বয়ম্বর সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমবেত রাজন্য-বর্গের যে মানসিকচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, তাহার একটি চিত্র :—

"আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোঽন্যঃ
কিঞ্চিৎসমাবর্জ্জিত নেত্রশোভঃ।
তির্য্যগ্বিসংসর্পিনখপ্রভেণ
পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্॥"[3]

কোন ভূপাল নয়নযুগল ঈষৎ অবনত করিয়া আকুঞ্চিত পদাঙ্গুলি দ্বারা স্বর্ণময় পাদপীঠ বিলেখন করিতে লাগিলেন। এখানে 'বিলিলেখ পীঠম্' কথাটিতেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হইল।

কবি হেমচন্দ্রের ইন্দ্রিলা—

"লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার।"

এবং রবীন্দ্রবাবুর চিত্রার 'দিনশেষ' কবিতাটিতে—

"শুধু এ সোনার সাঁঝে, কলস কাঁদিয়া বাজে,
কাঁকনে !"

এই শ্রেণীরই চিত্রকাব্য।

অন্যত্র এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিত্র গুলিতে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্যের অবতারণা না করিয়া, এমন কি একটি বিশেষণ পদেরও প্রয়োগ না করিয়া, চিত্রগুলির দ্রুত-অবলীলা গতিতেই তাহারা অধিকতর পরিস্ফুট প্রতীয়মান হয় ; এবং পাঠকদিগের নয়নের সম্মুখে সেই অবলীলাগতিতে পরস্পরকে অনুসরণ করে। যেমন—উত্তরার মূর্চ্ছাভঙ্গে—

"অনেক দিনের দূর-বিস্মৃত সঙ্গীত মত
পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত
সুখ-পূর্ণ, শোক-পূর্ণ ;—পিতৃগৃহ, নাট্যালয়,
বৃহন্নলা, সে অপূর্ব্ব উত্তর গোগৃহ জয়,
কৌরবের বেশভূষা, আনন্দে পুতুল-খেলা,
পাণ্ডবের পরকাশ, বিবাহ—আনন্দ-মেলা,
ছয় মাস সুখস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র মহারণ,
এ শিবির চক্রব্যূহ, হত-পতি-দরশন,—
তারপর অন্ধকার, মনে পড়িল না আর ;
পড়ে গেল যবনিকা, রুদ্ধ নাট্যগৃহ-দ্বার !"

নবীনচন্দ্র।

ইতিহাস লেখক * ও জীবনীকারের পক্ষে সহানুভূতির আবশ্যকতাও বড় কম নহে। একটি জাতির প্রথম জীবন-স্পন্দন হইতে বাল্যজীবনের চপলতা, পদস্খলন, উত্থানপতন, কৈশোরের আবেগ ও মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অবিমৃষ্যকারিতা, মধ্যজীবনের বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও সমীচীন কর্ত্তব্যনির্ণয়, বার্দ্ধক্যের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্য ও নির্ণীত-কর্ত্তব্যে অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষুব্ধধীরতায় অগ্রসর হইতে সাহসের অভাব পর্যান্ত অঙ্কিত করিতে হইলে, সেই জাতির এই সকল উত্থান পতনে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশে সক্ষম, একটি বলিষ্ঠহৃদয় ও মার্জ্জিতমস্তিষ্কের প্রয়োজন। গণিতবেত্তা যেমন জ্ঞাত সামগ্রীর সহিত অজ্ঞাত সামগ্রীর সম্বন্ধ প্রথমে জানিয়া লয়েন ও তাহা হইতে অজ্ঞাত সামগ্রীটি কি, তাহা নির্ণয় করেন, ইতিহাস প্রণেতাকেও সেইরূপ কতকগুলি আপাততঃ সম্বন্ধবিহীন ঘটনাবলীর মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। পূর্ব্ব সংঘটিত ঘটনা সমূহের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ পরকালবর্ত্তী ঘটনাগুলি কিরূপে ঘটিল, সেই প্রণালীটি বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার একটি প্রধান

* In history and in the whole region of concrete facts, imagination is as necessary as in poetry ; the historian, cannot invent his facts, but he must mould them and dispose them with a graceful congruity ; to do this is the work of imagination.

J. S. Blakie.

কার্য্য। ইহাতে অভিজ্ঞতা, পর্য্যবেক্ষণ ও এই উভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্পনাশক্তির যেরূপ প্রয়োজন, সহানুভূতির প্রয়োজনও তদপেক্ষা অল্প নহে। এতদ্ব্যতীত যখন কোন লেখক কোন বিজাতির ইতিহাস লিখিতে বসেন, তখন তাঁহাকে আর একটি অসুবিধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। তিনি বাল্যাবধি যে সমাজে লালিত পালিত, সেই সমাজের বিশেষ বিশেষ ধারণা ও কুসংস্কার তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আর যে জাতির ইতিহাস তিনি লিখিতে বসিয়াছেন, তাহার ধারণা, এমন কি কুসংস্কারের সহিতও তাঁহাকে পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। নচেৎ সেই জাতির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ ও জাতীয় চরিত্র নির্দ্ধারণে তিনি অকৃতকার্য্য হইবেন। এই কারণে মুসলমান রচিত হিন্দুজাতির ইতিহাসে বা ইংরাজরচিত ভারত ইতিহাসে আমরা অনেক অসমীচীন যুক্তি, সত্যের অপলাপ ও অযথা নিন্দাবাদ দেখিতে পাই।

ইতিহাস লেখকের ও জীবনীকারের কার্য্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উপরোক্ত গুণগুলির অধিকাংশ জীবনী-কারেরও থাকা চাই। যাঁহার জীবনী তিনি লিখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার জীবনের উপর তৎসাময়িক সামাজিক বিশেষত্ব কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তিনি কতদূর পর্য্যন্ত সেই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, কোথায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, কোথায় বা অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে সেই স্রোতের অনুগমন করিতে হইয়াছিল,

কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিভা ও মহত্ব তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-সুলভ-দৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আর কোথায় তিনি সাধারণের ন্যায় প্রবৃত্তিনিচয়ের ঝঞ্ঝাবাতে ঘূর্ণায়মান, তাঁহা দ্বারা সমাজ, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার কোন্ গুলিই বা চিরস্থায়ী ও চিরপূজ্য, আর কোন্ গুলিই বা বর্ষার পঙ্কিল জলপ্রবাহের ক্ষণিক আড়ম্বর মাত্র, এইসকল সূক্ষ্ম সীমান্ত নির্দ্ধারণ, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রতিভার সম্যক্ মহত্ব ও জীবনের সহস্র সুখদুঃখ অনুভব করিবার জন্য লেখকের প্রবল সহানুভূতির প্রয়োজন। কেবল মাত্র অনুসন্ধিৎসা, অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি থাকিলেই চলিবেনা।

কবি, ইতিহাসলেখক ও জীবনীকারের ন্যায় সমালোচ-কেরও সহানুভূতিতীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি গ্রন্থ সমালোচনাই করুন বা অপর বিষয়ের দোষগুণেরই বিচার করুন, তাঁহাকে সহানুভূতির সাহায্যে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইতে হইবে, দোষগুণ বাছিয়া লইতে হইবে। তার পর তাঁহাকে বাছিয়া গুছিয়া তাহা পাঠক বা দর্শকের সমক্ষে ধরিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা ভাল মন্দ চিনিয়া লইবেন। এস্থলে আমরা গ্রন্থ সমালোচকের সহানুভূতিপ্রবণ-হৃদয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

সমালোচনা—সাহিত্য-সুবর্ণের 'কষ্টি-পাথর'। সাধারণ পাঠক যখন কাঞ্চন ভ্রমে কাচ তুলিয়া লয়েন, অথবা বদরিকা

ভ্রমে মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, সমালোচক তখন তাঁহার সূক্ষ্মসহানুভূতির সাহায্যে পাঠককে কাচ কাঞ্চন, বদরিকা মুক্তা চিনাইয়া দেন। নহিলে সাধারণ পাঠককে সাহিত্যরাজ্যে বিচরণ করিতে হইলে পদে পদে বিপথগামী হইতে হইবে। সমালোচকের চক্ষে তাঁহাকে পথ দেখিয়া লইতে হইবে, চিত্র চিনিতে হইবে।

মনে কর সমালোচক কাব্যজগতের কোথাও কোন রমণী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। সহানুভূতিবলে তিনি তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার নাড়ীনক্ষত্র খুঁজিয়া বাহির করিলেন,—দোষগুণ বাছিয়া লইলেন। তারপর লেখনীর মুখে তাহার চরিত্রের অবিকল ছবিটি বাহির করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিলেন। পাঠক দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন, এ ঠিকই শ্যামাঠাকুরাণীর নিখুঁত 'ফটো,'—নির্ম্মল-পবিত্র-ছবিখানি। নহিলে এত সারল্যের দিব্যজ্যোতি আর কাহার হৃদয়ে সম্ভবে? লজ্জাবতীলতাবিনিন্দিত লজ্জার এমন সুবিমল আভাইবা রমণীকুলে আর কাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়? পতিভক্তির এমন সুধাময়ী সুশীতল ছায়াইবা আর কোন্ রমণীচিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হইতে পারে? পরের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে, পরকে দিতে থুতে এবং অন্নপূর্ণার ন্যায় পরকে অন্ন বিতরণ করিতেইবা আমরা এমন আর কাহাকে দেখিতে পাই? সুতরাং এ নিশ্চয়ই দেবী শ্যামাঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি— সন্দেহ নাই। সমালোচক সহানুভূতিবলে এইভাবে কাব্য-

জগৎ হইতে রমণীচিত্র তুলিয়া লইয়া তাহা পাঠককে চিনাইয়া দিলেন। এমন করিয়া সমালোচক রমণীচরিত্র চিনাইয়া না দিলে, পাঠক হয়ত ইঁহাকে ভক্তির চক্ষে না দেখিয়া ঘৃণা বা অবজ্ঞার নয়নে অবলোকন করিতেন ; এবং তাঁহার গুণরাশির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পদাঘাতে সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যদেশ সমূহে সাহিত্যসমালোচনার এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে সমালোচক গ্রন্থ গুলিকে প্রথম হইতেই বিচারকের নির্ম্মমচক্ষে দেখেন না,—ছিদ্রান্বেষণ করেন না। তাহাদিগের নিকট ছাত্রের ন্যায় অগ্রসর হয়েন এবং আপন হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি দ্বারা তদন্তর্গত সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অনুভব করেন। বহুকালব্যাপী পরিশ্রমের পর সমালোচক ধ্যানে সাহিত্যরাজ্যের বিশালবিস্তৃতি ও উদারগাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন ; তখন তিনি আপন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সেই ধ্যানলব্ধরাজ্যে সাহিত্যরথিদিগের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এইরূপ সমালোচনা অতিশয় প্রয়োজনীয়। যাঁহারা সময়ের অল্পতার জন্য বা শক্তির অভাবে সাহিত্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিবার অবকাশ ও সুবিধা না পাইয়া সাহিত্যরাজ্যের অপ্রশস্ত অনির্দ্দিষ্ট ও আবর্জ্জনাপূর্ণ পথ গুলির দিকে আকৃষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতে ও সেইপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতে ইহা সম্পূর্ণ

সক্ষম। এইপথে অগ্রসর হইলে পাঠক অতি অল্প সময়ে ও অনায়াসে সাহিত্যরাজ্য সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।

সমালোচক যদি ভ্রমে নিপতিত হইয়া তাঁহার নিয়ম পদ্ধতিটিকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়া তুলেন, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিভাশালী পাঠকের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় বটে, সমালোচকের প্রতি অবিচল বিশ্বাস বশতঃ তিনি সাহিত্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে ততটা সক্ষম হয়েন না; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে একথাটি খাটে না। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি অপেক্ষা অভিজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টি উদারতর হওয়াই সম্ভবপর। প্রতিভাশালী পাঠককে সমালোচকের সঙ্কীর্ণ পথে অধিক দিন বিচরণ করিতে হয় না। কারণ তাঁহার প্রতিভা পূর্ব্ব সমালোচকদিগের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া শীঘ্রই প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ঈদৃশ সমালোচনপদ্ধতি আদরণীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১

ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে আদিভাষা সংস্কৃতই যখন ভারতবর্ষে কথোপকথনের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত, ভারতের পুণ্যময় নামটির চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া যখন অপর দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পুষ্পরাশি বর্ষিত হইত, সেই সময়ে তমসানদীতীরবর্ত্তী তাল-তমাল-তরুদল-সমাকীর্ণ এক অতি বিশাল বনপ্রদেশে একটা ভীমাকৃতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র দেখা দিল। ব্যাঘ্র বলবিক্রমে বলীয়ান্‌। প্রতিদিন সে কত শত শত নিরীহ দুর্ব্বল প্রাণীর যে সন্থ জীবন ধ্বংস করিয়া স্বকীয় উদরপূর্ত্তি করিতেছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বহুবৎসর এইভাবে অতি-বাহিত হইল, কাননের জীবদল প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। ব্যাঘ্র তথাপি জীবহিংসায় বিরত নহে। কেনই বা বিরত হইবে? জীবহিংসাই যাহার ব্যবসা এবং জীবনের মহাব্রত, সে তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে কেন? এইরূপ প্রতিনিয়ত জীবহিংসা করিতে করিতে সীমা অতিক্রম করিয়া সে পাপের কর্দ্দমে, নির্দ্দয়তার কঠোর বিলেপনে পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিল। কর্কশদেহ ঘোর নির্ম্মমতার কালিমায় কলঙ্কিত হইল। বজ্র-

কঠিনকলেবর অজস্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিল না—টুটিল না—বা বিন্দুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না। পাষাণ—পাষাণই বটে। পাষাণের উপমা—পাষাণ বই আর কি? কিন্তু চিরজীবন কাহারও একভাবে যায় না,—পরিবর্ত্তন আছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। বিশ্বরাজ্যের সকলই পরিবর্ত্তনলীলাচক্রের আবর্ত্তনে সতত বিঘূর্ণিত। পরিবর্ত্তনে পাষাণও নবনীত-কোমলত্ব ধারণ করে। পাষাণ গলিল। কালের পরিবর্ত্তনে পাষাণ গলিল। সহসা কোথা হইতে কে যেন আসিয়া পাষাণের হৃদয় গলাইয়া দিয়া গেল। কাঠিন্য—কোমলত্বে পরিণত হইল। পাষাণের চক্ষু ফুটিল,—অন্ধত্ব ঘুচিল। নয়নজ্যোতি কারুণ্যে পরিপ্লুত হইল। স্নেহসকরুণ দৃষ্টি হঠাৎ সুদূর কাননাভ্যন্তরে ছুটিল। দেখিল—কোন জীবহিংসাপর দুরাচার ব্যাধ আসিয়া বৃক্ষশাখাসীন এক কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিল। রক্তাক্ত কলেবরে ক্রৌঞ্চ ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রাণবায়ু বিসর্জ্জন করিল। তখন ক্রৌঞ্চবধূ ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত কলেবরে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং প্রিয় সহচরের সহিত চিরবিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া, কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। অমনই পাষাণের প্রাণে আঘাত লাগিল। সহানুভূতির মন্ত্রপূত-বারিধারা পানে পাষাণের পাষাণপ্রাণ তন্ময় হইয়া গেল। ক্রৌঞ্চীর করুণকণ্ঠস্বরে পাষাণবক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

পাষাণের মুখ হইতে অনর্গল সুধাধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। সে সুধা,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগম শাশ্বতীসমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃকামমোহিতম্॥"

পর ক্ষণেই পাষাণের গাত্র হইতে অঙ্কুরোদ্গত হইয়া একটি দিব্য পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। পাষাণে ফুল ফুটিল,—সৌগন্ধে দিগ্দিগন্ত আমোদিত করিল। রূপের বিভায় বিশ্ব-সংসার আলোকিত, বিভাসিত ও উজ্জ্বলীকৃত হইল; আঁধার ঘুচিল।

পাষাণে—কুসুম, কুসুমে—সুবাস, এ অতি বিস্ময়কর দৃশ্য! কল্পনার সীমান্তরাজ্যের মনোমুগ্ধকরী ছবি! সৃষ্টিরাজ্যের অচিন্ত্যপূর্ব্ব-বৈচিত্র্যময়ী-লীলা! সেই বজ্রকঠিন পাষাণের নাম—মহাকবি মহর্ষি—**বাল্মীকি**, আর পরিমল-পরিপূর্ণ-সুবাসিত-কুসুম—তৎসৃষ্ট মহাকাব্য—**রামায়ণ**।

রামায়ণের মধুরগীতি দুই যমজ সন্তানকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ধ্বনি—সুদূর কোশল রাজকুমারের কর্ণে প্রতি-ঘাত করিল। রাজকুমার উন্মত্ত হইলেন। রাজধানী, রাজপুরী বিচলিত হইল। রত্নাকর দস্যুর পাপাচার কাহিনী জগতের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গেল,—নাম পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল,—রত্নাকর—**বাল্মীকি** হইলেন।

মহর্ষির মুখোচ্চারিত এই পুণ্যময় শ্লোক যেন তখনকার জীবসহানুভূতিহীন ব্যাধের প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যথিত

হৃদয়ের ভাষা! সত্যই তখনকার সভ্যতার চরম ফলে ভারত-বক্ষ হইতে নির্ম্মমতা, নির্দ্দয়তা সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় সুদূরে ত্রস্তে পলায়ন করিতেছিল। জীবের প্রতি এত সহানুভূতি অন্য কোন দেশের চরম সভ্যতার ফল বলিয়া মনে হয় না। স্কচ্ কবি বার্ণস্, হলের ফলকে ভগ্নবাস-মূষিকের প্রতি সহানুভূতিআর্দ্রকণ্ঠে বেদনাব্যথাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে কেবল কবিজনোচিত মমত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাতে প্রকৃত জীবসহানুভূতি কোথায়? আর ভারতীয় কবির কাদম্বরী, শকুন্তলা, রঘুবংশ এবং উত্তর রামচরিতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাঁহাদের হৃদয় জীবসহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, বর্ষাস্নাত-প্রকৃতির ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল।

ভারতীয় কবি যখন নৃপতিগণের মমতাহীন মৃগয়ার অনুগমন করেন, তখন তাঁহার সহানুভূতিমাখা হৃদয় কেবল ব্যথিতচিত্ত হরিণহরিণীর পদের ক্ষিপ্রগতি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। তাই কালিদাসের রঘুবংশে মহারাজ দশরথের মৃগয়াক্রীড়া এত সংযত—এত স্নেহকোমল!

"লক্ষ্যীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ
প্রেক্ষ্যস্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণাকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী
বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসঞ্জহার॥"

ইন্দ্রবিক্রান্ত দশরথ এক হরিণকে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তাহার প্রিয় সহচরী হরিণী, তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনি

তাহার সম্মুখে আবরণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে প্রেমানুরাগী নৃপতি করুণরসে আর্দ্র হইলেন; এবং আকর্ণ পূরিত বাণ সংযত করিয়া তূণীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

অন্যত্র কবি, শকুন্তলায়—মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়াক্রীড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঋষিগণের মুখদিয়া বাণ-বিদ্ধোদ্যত মহারাজের প্রতি—

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশা বিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতংচাতিনোলম্
ক্ব চ নিশিত নিপাত্য বজ্রসারাঃ শরাস্তে।"

'মহারাজ! বাণ নিক্ষেপ করিবেন না। এই মৃগের মৃদুশরীরে আপনার বজ্রসার সদৃশ শর (তূলা রাশিতে অগ্নির ন্যায়) নিক্ষেপ করিবেন না। উহাদের অতি কোমল জীবনের সহিত কি আপনার বজ্রকঠিন শরের তুলনা হয়?' যে কয়টি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীব-সহানুভূতিপ্রবণ কোমল হৃদয়ের ব্যথিত মনোভাব গুলিকে আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মহর্ষির সেই নবীন প্রাণের নব জাগ্রত ব্যাকুলতা,—সহানুভূতির সেই তীব্র উদ্দীপনার বিদ্যুতপ্রবাহ, একদিন স্নান-নির্ম্মল-সুনীল-স্বচ্ছ শারদাকাশের শুক্ল নিশিথিনীর চন্দ্রতারকার জ্যোতির্ম্ময় কিরণপ্রবাহে পরিণত হইয়াছিল। সে দিনটি আজিও ভারতের হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মের গভীর

রহস্যের ন্যায় চির জাগরূক। আজিও কোন প্রতাপান্বিত নরপতির সুশৃঙ্খল সুশাসিত রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, লোকে বলে—‘যেন রাম-রাজত্ব!’ হিন্দু বালিকা আজিও ব্রত কথার পর, করুণ প্রার্থনায় বলে—‘যেন সীতার মত সতী হই,—রামচন্দ্রের ন্যায় পতি পাই,—লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর পাই।’ ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ‘রামায়ণ’ হিন্দুর শোণিতে শোণিতে মাখান রহিয়াছে। রক্তহীন জীবন নাই,—রামায়ণহীন হিন্দুও নাই। এমন বিশ্বব্যাপক আদর্শ চরিত্র যে মহাকবি সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাঁহার হৃদয়মুকুরে বিশ্বসহানুভূতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্যমাত্র।

২

ভারতীয় বরপুত্রগণের প্রতি যখন ভারতীয় নৃপতিগণের বিশেষ শ্রদ্ধানুগ্রহ ছিল, ভারতবর্ষে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল অনুশীলন চলিতেছিল, সেই সময়ে মহাকবি কালিদাস ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। বাগ্দেবীর অপরিমেয় করুণা প্রসাদফলে তিনি সুদুর্লভ কবিত্বশক্তি লইয়া ভারতবর্ষে জন্মপরিগ্রহ করেন। কালিদাস উজ্জয়িনী নগরাধিপতি বিক্রমাদিত্য রাজার 'নবরত্ন' নামক 'পণ্ডিত-সভার' প্রধান রত্ন ছিলেন। কালিদাস সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে জগতে অদ্বিতীয়। চরিত্রাঙ্কনেও তিনি অনন্যসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাই স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন :—

"যাহারা কাব্যশাস্ত্রের রসস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরা বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্ব-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবি কালিদাসের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।"

আর এক স্থলে বঙ্গের প্রতিভাশালী সাহিত্য-সমালোচক চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্বে' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন।' মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মাণ নাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব. পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'।"

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' যে কবির কল্পনাময়ী লেখনী-নিঃসৃত এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সর্ব্ব প্রথমে উহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপর য়ুরোপীয় যাবতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া উহার যশোসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি আমাদের অল্প গৌরবের বিষয়! পরে ফষ্টরকৃত জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করিয়া, জর্ম্মাণকবি গেটে লিখিয়াছেন :—

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এক নামে সমাবেশিত দেখিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমারই নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের মতে 'কালিদাসস্য সর্ব্বস্ব

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।' শুধু কালিদাসের জীবন সর্ব্বস্ব নহে; উহা আর্য্য কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। তাই 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' হইতেই আমরা মহাকবি কালিদাসের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যরচনায় সহানুভূতির কতদূর প্রভাব ছিল, তাহাই পাঠককে উপহার দিব।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রধানতম উপকরণ অলঙ্কার সংযোজন। অলঙ্কারবিভূষিত না হইলে, কোন বস্তুই সুন্দর দেখায় না, মনোরঞ্জন হয় না। হার, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে যেমন মানব দেহের শোভা সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কাব্য-চরিত্র-চিত্রও তেমনই অলঙ্কারবিভূষিত হইলে তাহার সৌন্দর্য্যশ্রীর উৎকর্ষতা সাধিত হয়। তাহার সেই শোভাসম্পাদন ও পরিবর্দ্ধন জন্য অলঙ্কার-শাস্ত্র-ভাণ্ডারে বহুবিধ অলঙ্কার আছে। তন্মধ্যে উপমালঙ্কারই সমধিক সৌন্দর্য্যসাধক। মহাকবি কালিদাস সেই উপমালঙ্কারেরই ভাণ্ডারস্বরূপ ছিলেন। তাই প্রচলিত কথায় শুনিতে পাই,—'উপমা কালিদাসস্য' পৃথিবী বিখ্যাত কথা! যেমন বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, মদনের কুসুমশর, তেমনই কালিদাসের উপমা অব্যর্থসন্ধান। পৃথিবীতে এমন উপমা-নিপুণ-কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কাব্য-চরিত্র-চিত্রে অলঙ্কার সংযোজন বা সুবিন্যাস করা সহানুভূতির প্রয়োজন। সৃষ্টচিত্রের কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার খানি পরাইলে চিত্রের সৌন্দর্য্য বাড়িবে, কোন্ স্থলেইবা তাহার সমাবেশ সুসঙ্গত, এ সকলের অভিজ্ঞতা—সহানুভূতিসাপেক্ষ।

চরিত্রাঙ্কনেও ততোধিক সহানুভূতি-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির প্রয়োজন। এস্থলে তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

কালিদাসের সৃষ্টচরিত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শকুন্তলা চিত্রেই আমরা কবি-সহানুভূতির প্রোজ্জ্বল প্রতিভা প্রতিভাত দেখিতে পাই। অলঙ্কার বিন্যাসেই বল, আর চরিত্রগঠনেই বল, শকুন্তলা জগতে অতুল্য।

শকুন্তলা—ঋষিকন্যা, ঋষিপালিতা,—তপোবনে রক্ষিতা। পর্ণকুটীরই তাঁহার সুখময় বাসস্থান। শকুন্তলা—বনলতা সদৃশা, এ বনলতার সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। কাননাভ্যন্তরে শকুন্তলার প্রথম দর্শনেই দুষ্মন্ত বিমুগ্ধ। শকুন্তলার অনুপম রূপলাবণ্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের যত্নরক্ষিত রূপরাশিকে মন্দীভূত করিল। তাই তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন :—

"শুদ্ধান্ত দুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনোজনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

আশ্রমবাসিজনের এইরূপ দেহাবয়ব যদি রাজান্তঃপুরেও দুর্লভ হয়, তাহা হইলে অযত্নবর্দ্ধিতা বনলতাকর্ত্তৃক, সৌন্দর্য্য-শালিনী যত্নপালিতা উদ্যানলতা দূরীকৃতা হইল।

অন্যত্র, শকুন্তলাকে বল্কলপরিহিতা দেখিয়া—

"সরসিজ মনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং
মলিমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং॥"

শৈবালকর্ত্তৃক অনুবিদ্ধ হইলেও পদ্মকে পরম রমণীয় বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে। চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিলেও উহা শোভাই বিস্তার করে। এই স্বভাবসুন্দর কৃশাঙ্গী বল্কলাবৃতা হইয়াও অধিকতর মনোজ্ঞা হইয়াছেন। অথবা মধুরাকৃতির পক্ষে কোন্ বস্তু না ভূষণ স্বরূপ হয়?

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' এইরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি পত্রে পত্রে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী সরলতার মনোমোহিনী ছবি খানি! তাঁহার অন্তরে কোথাও কলঙ্কের ছায়া নাই। পবিত্র, সুন্দর ও কোমল উপাদানে তাঁহার দেহ, মন গঠিত। তপোবনে প্রতিপালিতা বলিয়া বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জল সিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন। শিশিরস্নাত নব মল্লিকাবৎ নেত্রতৃপ্তিবিধায়িনী এবং সুগন্ধ বিকীর্ণকারিণী। বৃক্ষ লতাদির সহিতই তাঁহার অভেদসম্বন্ধ। তাঁহার স্নেহমমতা, প্রীতিভালবাসা সকলই অরণ্যজাত তরুলতার উপর, আর বন-বিহারী পশুপক্ষীর উপর। কবিহৃদয়ের জীবসহানুভূতি শকুন্তলার সরল-নির্ম্মল-চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত। নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনে তাহা পরিষ্কার পরিস্ফুট।

যখন অনসূয়া বলিলেন, "অয়ি শকুন্তলে! তোমা অপেক্ষাও এই আশ্রমবৃক্ষগুলিকে তাত কণ্ব অধিক ভালবাসেন। এই কারণে বোধ হয় নবমল্লিকার ন্যায় তুমি সুকোমল হইলেও

তাত কণ্ব ইহাদিগের আলবালে জলসেচনে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।”

তখন শকুন্তলা বলিলেন, “অয়ি অনুসূয়ে! আমি যে কেবল তাত কণ্বের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া এই জলসেচন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে, ইহাদের প্রতি আমার সোদরস্নেহও আছে।”

অন্যত্র—

অনু। “অয়ি শকুন্তলে! দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে স্বয়ম্বরা হইয়া সহকার তরুকে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?”

শকু। “বনতোষণীকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আমি আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যাইব।”

‘অভিজ্ঞান শকুন্তলের’ এই স্থানে কালিদাসের ‘কল্পনা—কল্পতরু,’—সহানুভূতি দিগন্ত-সঞ্চারিণী,—কবিত্বশক্তি সুধা-নিস্যন্দিনী। আবার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সাধন, প্রেমানুরাগের পূর্ণবিকাশ, মানবচরিত্রের মধুর প্রতিকৃতি এই স্থানেই দেখিতে পাইবে। এখানে কোথাও আশার মধুর ঝঙ্কার,—কোথাও নৈরাশ্যের হা হুতাশ, কোথাও ব্রীড়াসঙ্কোচের স্নিগ্ধছায়া,—কোথাও পূর্ব্বরাগের তপ্তশ্বাস। কোথাও গুরুজন-ভীতি,—কোথাও সখি-সম্মিলন-প্রীতি। তাই এস্থান ‘উজ্জ্বলে মধুরে’ মিশ্রিত। এখানে সৌন্দর্য্যে আত্মনিমজ্জন, প্রেমে আত্মসংগ্রাম, কুশাগ্রে চরণক্ষয়, তরুশাখে বল্কলাকৃষ্টি, এ

সকলও আছে। আবার নবমল্লিকায় সোদরাস্নেহ, সহকারে ভ্রাতৃস্নেহ, হরিণ শিশুতে অপত্যস্নেহও আছে। একত্রে একস্থলে এত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, এত চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব প্রস্ফুটন, কালিদাস ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

আর এক স্থলে ঃ—

শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের পর রাজা নিজরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। মহর্ষি কণ্ব তীর্থযাত্রাগত। সখিদ্বয় শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজার্থ তপোবনান্তরালে পুষ্পচয়নে বিনিযুক্তা। শকুন্তলা একাকিনী তপোবন-বেদিকাসীনা এবং দুষ্মন্ত চিন্তায় বিমগ্না—বিবশা—আত্মজ্ঞান-বিরহিতা। এমন সময় জ্বলন্ততপোমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ঋষি অতিথিরূপে কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পতি-চিন্তা-মগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার মুখনিঃসৃত—

'অয়মহং ভোঃ'

শুনিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার—

"আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।" তাহাও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ পথ পাইল না ; তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন ঃ—

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্য মানসা
তপোনিধিং বেৎসিন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপিসন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কথামিব॥"

অয়ি বালে! তুমি যাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপস্থিত অতিথির কথায় কোন উত্তর দিলে না, এবং একাগ্রচিত্তে যাঁহার ধ্যান করিতেছ, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি তোমায় স্মরণ করিবেন না।

শকুন্তলার এ তন্ময়ত্বভাব কবি-সহানুভূতিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' কালিদাস দুর্ব্বাসা ঋষির অবতারণা করিয়া ঘটনাবৈচিত্র্যের এক অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব এবং চরমোৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন। তাহা না হইলে নাটকের নাটকত্ব সম্পাদিত হইত না। শকুন্তলা চরিত্রের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইত না। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'—সাধারণ উপাখ্যানরূপে সাধারণে আদৃত হইত মাত্র। কালিদাসের কবিত্ব-প্রসূন সাহিত্যকাননে অপ্রস্ফুটিতই রহিয়া যাইত।

তারপর মহর্ষি কণ্বের কথা—

কণ্ব-চরিত্রেও কালিদাস সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কণ্ব—কন্যারূপিণী শকুন্তলার পতিগৃহ গমন কালে তাঁহার ভাবি-বিরহ-চিন্তা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন :—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্ট মুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধিগদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ॥"

অদ্য শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত, নয়নযুগল অবিরত বাষ্পবারি পরিপূর্ণ, কণ্ঠরোধ হইয়া

বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, চিন্তাবেগে দৃষ্টি জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, আমারই যখন এই অবস্থা, তখন না জানি সামান্য গৃহস্থের কন্যাবিরহে কি নিদারুণ যন্ত্রণাই না উপস্থিত হয়!

যিনি গৃহত্যাগী, সংসারবিরাগী, কুটীরবাসী, ফলমূলাহারী ঋষির কঠোর হৃদয়ে এইরূপ স্নেহবাৎসল্যের সুধা ঢালিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সহানুভূতি-পূজক ও কবি।

কালিদাস সমগ্র পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদিগকে মানবপ্রেমের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন যে, মানব মানবীর ন্যায় তাহারা প্রিয়জনবিরহভয়ে আকুল। তাই হরিণশিশু, শকুন্তলার পতিগৃহগমনোন্মুখ গতিকেও বাধা দিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া রাখে, কোকিল করুণ কণ্ঠতানে আপনার বিদায় সঙ্গীত উপহার দেয়, বৃক্ষলতাদি প্রেমাবেশে মানবী সখীকে শাখাভুজে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করে। এমন বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ভারতীয় কবিতেই সম্ভব। পতিগৃহগমন কালে গতিবাধাপ্রাপ্তা শকুন্তলা যখন মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে?' তখন কবি, যেন স্নেহ-ছল-ছল চক্ষে একবার সেই কোমলকায় হরিণশিশুটিকে দেখিয়া লইলেন। তাহার হৃদয়-ব্যথা যেন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কণ্বমুখে বলিলেন :—

"বৎসে!

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোহণমিঙ্গুদীনাং

তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে

শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥”

যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক ধান্য সযত্নে আহরণ করিতে, যাহার কোমল মুখ কুশাগ্রভাগে ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদী তৈল দ্বারা ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, দেখ বৎসে! সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছে, পথ পরিত্যাগ করিতেছে না।

শাপ মোচনান্তে রাজার মোহভঙ্গ। মোহাবসানে তিনি শকুন্তলাবিরহে অধীর—উন্মত্ত—আত্মহারা,—আহার-বিহারে বীতস্পৃহ—রাজকার্য্যে অনাসক্ত। তাই, রাজকার্য্যভার মন্ত্রীহস্তে। শকুন্তলাবিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি বিশ্বসংসার মসীময় দেখিতেছেন। তার পর দৈবানুগ্রহে পত্নীপুত্র সহ অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই সম্মিলন সমাবেশে কবি, কল্পনাশক্তির অপূর্ব্ব কৌশল এবং সহানুভূতির অসামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাজা পত্নীবিরহশোকে নিদারুণ সন্তপ্ত। বিয়োগান্তে মিলন অপরিমেয় সুখের নিদান! দুঃখের পর সুখ—আকাঙ্ক্ষার পরিণাম! তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়? কিন্তু অকস্মাৎ সম্মিলনে বিষময় ফল প্রসূত হইতে পারে, তাই কবি অপূর্ব্ব কৌশলে বিশেষ সতর্কতার সহিত 'সম্মিলনের ক্রম-বিকাশ' প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজা মারীচাশ্রমে সমাগত। তথায় দেখিতে পাইলেন, একটি সুকুমার শিশু, একটি সিংহশিশুর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে

তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া বড়ই উৎপীড়িত করিতেছে। তাপসিগণ শিশুর এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দেখিয়া সিংহশাবককে ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু বালক সহজে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ছেলে নয়, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল না; তাই অপরা তাপসী বলিলেন, 'বৎস! ইহাকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় অপর একটি ভাল খেলানা দিব।' 'কৈ দাও,'—এই বলিয়া বালক হস্ত প্রসারণ করিল। রাজা দেখিলেন, বালকের হস্তে রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ। দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তবে কি এ ঋষি-কুমার নয়! রাজা সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য শিশুসহচারিণী তাপসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বালকটি কাহার পুত্র?' তাহারা কহিলেন, 'কে সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগী পাপিষ্ঠের নাম মুখে আনিবে?' রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ তিরস্কার যেন আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আচ্ছা, বালকের মাতার নাম কেন জিজ্ঞাসা করি না; অথবা পরস্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও সঙ্গত নহে। ইত্যবসরে পর্ণকুটীর হইতে অপরা তাপসী একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ময়ূর আনিয়া বালককে বলিল—'এই দেখ শকুন্ত-লাবণ্য?' বালক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—'কৈ আমার মা কৈ?' নামাক্ষরে সাদৃশ্য থাকাতে মাতৃ-বৎসল বালকের মা'র কথা মনে পড়িল। রাজা এইবার আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন,—'এই বুঝি আমার শকুন্তলাপুত্র।' আবার ভাবিলেন,—'এ নাম ত অপরেরও থাকিতে পারে।' ইহার পর তাপসিগণ বালকের হস্তে রক্ষাকাণ্ড (তাগা) দেখিতে না পাইয়া,

উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘ইহার রক্ষাকাণ্ড কোথায় ?’ তখন রাজা উত্তর করিলেন—‘আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, সিংহশিশুকে পীড়ন করিবার সময় তাহা এইখানে পড়িয়া গিয়াছে,’—এই বলিয়া তাহা তুলিতে গেলেন। অমনই তাপসীরা ব্যগ্রতাসহকারে বলিতে লাগিলেন—‘উহা তুলিবেন না, তুলিবেন না—স্পর্শ করিলেন কি ?’ রাজা কহিলেন—‘কেন ?’ তাপসিগণ বলিতে লাগিলেন,‘মহাভাগ! শ্রবণ করুন; এই রক্ষাকাণ্ড বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে ভগবান মারীচ অর্পণ করিয়াছেন। বালক ও বালকের পিতামাতা ভিন্ন অপর কেহ উহা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করে।’ রাজা অগ্রেই তাহা ভূমি হইতে তুলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাকে সর্প হইয়া দংশন করে নাই। তখন নিশ্চিত অবধারিত হইল, ইনিই বালকের পিতা—রাজা দুষ্মন্ত। রাজার সকল সন্দেহ অপনীত হইল। তার পর শকুন্তলার সহিত রাজার—

“প্রেম-সম্মিলন।”

রহস্যভেদের কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ! সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কি মনোমুগ্ধকর কৌশল!! কল্পনার কি মনোহারিণী লীলা!!! কালিদাসের কবিত্বে একাধারে এ কৃতিত্ব জগতে অতুলনীয়।

৩

যাঁহার জন্মভূমি লইয়া একসময়ে ইংলণ্ডের সংহস্রভূমিখণ্ড স্ফীতবক্ষে সাহঙ্কারে স্বত্ব ঘোষণা করিতেছিল, যাঁহার কবিত্ব-প্রসূনের মধুর সৌরভে সভ্যজগতের প্রতিগৃহপ্রাঙ্গন আজিও আমোদিত হইতেছে, যাঁহার প্রতিভা ও কল্পনার নবনবোন্মেষ-কারিণীশক্তির বিশদ প্রস্ফুরণ জগৎবিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজি আমরা সেই বিশ্বপূজ্য অমরকবি সেক্স্পীয়রের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অত্যদ্ভূত বিশেষত্ব এবং সার্ব্বভৌম সহানুভূতির প্রোজ্জ্বল চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যে সেক্স্পীয়র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে জগতের সকল কবি অপেক্ষা উচ্চ আসনের অধিকারী বলিয়া মনে করেন। কবি হেমচন্দ্র বলেন, "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি!" কালিদাস বড় কি সেক্স্পীয়র বড়, কবি-সাধারণ হইতে সেক্স্পীয়রের আসন উচ্চ কি নীচ, এস্থলে আমরা সে বিচার করিব না; প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। লোকচরিত্রাঙ্কনে তাঁহার কল্পনাশক্তির যে এক অদ্ভূত বিশেষত্ব ছিল, এস্থলে তাহাই বিবৃত হইতেছে। সেক্-স্পীয়র এই অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব লইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পৃথিবী হইতে একখণ্ড প্রস্তর ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা কিছুক্ষণ পরে মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে নীচে নামিয়া আসে, সমস্ত দিবস নীলাকাশে উড়িয়া উড়িয়া পাখী যখন প্রদোষে

ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার ক্ষুদ্র কুলায় যেমন তাহাকে স্নেহ-আকর্ষণে আপন বক্ষে টানিয়া লয়, সেইরূপ প্রকৃত কবিকল্পনা যতই উন্মুক্তপক্ষ হউক না কেন, বাস্তব জগতের আকর্ষণ কখনই ভুলিতে পারে না। সে আপন নীলাকাশের সমুচ্চ প্রাসাদ হইতে ধরণীপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র মানবগুলিকে সহানুভূতিনেত্রে পুনঃ পুনঃ দেখে ও আপন মনোহর মানসপুত্তলিগুলিকে সেই নিম্নদেশবিহারী, গাঢ়তর সমীরসেবী, কঠিন মৃত্তিকাবাসী মানব-গুলিরই আদর্শে গঠিত করে।

সেক্‌স্পীয়র উদারতম সহানুভূতির অধীশ্বর। তাঁহার কল্পনাও তাই অপ্রতিহতপক্ষ। পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আছে, কিন্তু পাপীর প্রতি নাই। তিনি সহানুভূতিতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কলুষিত হৃদয়েও পূর্ব্বের নিষ্পাপ অবস্থার দুই একটি সুকুমার মহত্ত্বের বীজ দেখিতে পান। আবার ভ্রান্ত সহানু-ভূতিতে অন্ধ হইয়াও তাহার গুরুতর পাপকে লঘু করিয়া চিত্রিত করেন না। তিনি প্রকৃতির মানচিত্রের উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া যেখানে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, অবিকল অঙ্কিত করিয়া-ছেন, কোথাও বিন্দুমাত্র বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করেন নাই। "He sees things as they are with their ugly and beautiful details by imitative Sympathy." মুকুরবিম্বিত অবয়বের ন্যায় তাঁহার নাটকে আমরা মানবপ্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। মনুষ্যজীবনে ঠিক যেরূপ ঘটে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, সুন্দরই হউক আর

কুৎসিতই হউক, সেই ভাবেই তাঁহার নাটকে চিত্রিত দেখি। যে চিত্রের যেটি নিজস্ব, তাহা দিয়া তাহাকে সাজাইতে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার সৃষ্ট কোন চরিত্র এইজন্য অপূর্ণ নহে। অপূর্ণতা পূরাইবার জন্য তাঁহার নিজ প্রকৃতির বিশেষত্ব কোন চরিত্রে অসং-লগ্নভাবে প্রবেশ করাইতে হয় নাই। হ্যামলেটের হ্যামলেটত্বের কোন স্থানে অভাব হয় নাই; সেক্স্পীয়রত্ব দিয়া সে অভাব পূরাইতে হয় নাই। ইহাই সেক্স্পীয়রের চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব। এই জন্যই তাঁহার নাটকস্থ কোন চরিত্র হইতে তিনি স্বয়ং কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। এসম্বন্ধে বঙ্গের প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"কেহ তাঁহার নাটকে ব্যবহারাজীবের প্রণালী পদ্ধতির সহিত ভূয়িষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে আইন ব্যবসায়ী অন্ততঃ উকীলের অতি নিকটস্থ ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন। কেহ তাঁহার নৌবিদ্যা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নাবিক স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কেহ ডাক্তার, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ যোদ্ধ্‌পুরুষ, কেহ কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতি-পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও চেষ্টার সফলতা হয় নাই। * * * আমরা দেখিতে পাই সর্ব্ববিধ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমান অভিজ্ঞতা। তিনি যখন ফরাসি দেশের প্রান্তরে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সৈনিকের ছবি অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, তিনি বুঝি আজীবন কেবল সেনা সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ

করিয়াছেন। তিনি যখন বীচি-ক্ষুব্ধ-সমুদ্র-বক্ষে নেপলস্ রাজ্যের মজ্জমান অর্ণবযানের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, বুঝি তাঁহার সারাজীবন নাবিকবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি যখন মিশরবাসী ক্লিয়োপেট্রার বিলাস-শয্যার উপান্তে সারল্য ও বর্ব্বরতার প্রতিমূর্ত্তি সাপুড়িয়াকে স্থাপন করেন, তখন মনে হয়, বুঝি জন্মাবধি এই শ্রেণীর জীবই তাঁহার আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। * * * সেক্স্পীয়রের ব্যাপক সহানুভূতি, উদার অপক্ষপাতিতার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বত্র সহানুভূতিশালী, কোন পদার্থের প্রতিই দ্বেষযুক্ত নহেন। সেই জন্য তাঁহার চিত্তরূপ জাগতিক-দর্পণ পদার্থের যথাযথ প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ ছিল। * * * এই সহানুভূতির বলে তিনি সকল প্রকার চরিত্রে আত্মনিমজ্জন করিতে পারিতেন। নদী যেমন আপনা হারাইয়া সাগরে মিশ্রিত হয়, সেক্স্পীয়র সেইরূপ আপনার ব্যক্তিত্ব যখন যে চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন, তাহাতে মিশাইয়া দিতেন। সৃষ্ট চরিত্রের একীভাব তাঁহার প্রতিভার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব।”

আমরা কাব্যের পক্ষপাতী। কবি আমাদের ভক্তিপ্রীতি-ভাজন সুহৃৎ। কবির কাছে আমরা অনেক বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। কবি—একপক্ষে সমাজের শিক্ষক, সমাজের গুরু। মানুষকে পাপে প্রতিনিবৃত্ত রাখিতে, পুণ্যে উৎসাহিত করিতে, কবি যেমন কৃতকার্য্য অপরে তেমন নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের উপদেশ কর্ণপটহে প্রতিঘাত করে বটে, কিন্তু

অন্তরেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কবির ভাষা মর্ম্মস্পর্শী, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করে, হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ধর্ম্মপ্রচারকের কথা বাহ্যেন্দ্রিয় স্পর্শ করে মাত্র। ধর্ম্মপ্রচারক কহিলেন—'বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নরকে ডুবিতে হইবে।' তাহা হয় ত আমরা শুনিয়াও শুনিলাম না। নরক কি,—নরক কেমন, তাহা তিনি বুঝাইতে পারিলেন না। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে। তিনি সেই নরকের এক বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন; আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, ভীতি-সংক্ষুব্ধ-চিত্তে চাহিয়া দেখিলাম,—'পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের রাজ্ঞীর চক্ষে ঘুম থাকিয়াও নাই; তেমন নিদ্রার অপেক্ষা জাগরণ ভাল। এদিকে গভীর নিশায় লেডী ম্যাক্‌বেথ দীপহস্তে করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আছে অথচ চলিয়া বেড়াইতেছেন, নিদ্রায় তাঁহার শান্তি নাই; কেননা তিনি বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন,—নিদ্রিতকে জোর করিয়া চিরনিদ্রিত করিয়াছেন। কবির সঙ্গে, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই হতভাগিনীর পাপ-আশীবিষ-দংশিত মনের উদ্‌ভ্রান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিলাম,—ভীত হইলাম। পার্শ্বে চিকিৎসক ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'হায়, হায়, যাহা তুমি জানিয়াছ, তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না,—রোমাঞ্চ হইল।' সামান্য পরিচারিকা, সে উঠিয়া বলিল, 'সমস্ত শরীরের গৌরবের জন্যেও আমি এমন হৃদয় বক্ষের ভিতর চাহি না,—দাসীর মুখের কথা শুনিয়া হৃদ-

য়ের ভিতর হৃদয় ডুবিয়া গেল *।' কাব্বর কাছে বিদায় লইলাম, কিন্তু এ অপূর্ব্ব নরকচিত্র হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল। অমর কবি সেক্স্পীয়রের এই জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুলিবার নহে। তাই বলিতেছিলাম,—পাপের কদর্য্যতা দেখাইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে কবি অদ্বিতীয়।

সেক্স্পীয়র যে সকল নরনারী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সকল গুলিই যেন জীবন্ত-প্রতিমূর্ত্তি। তাহাদের একটিও মাটির পুতুল নহে, একটিও পাষাণ-প্রতিমা নহে; রক্তমাংসময় সজীব শরীরী। তাহাদের এই জীবন্ত ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন, তাহাদের শরীর বিদ্ধ করিলেও শোণিতপাত হইবে। কাব্য-জগতে যখনই তাঁহার এই সকল সজীব মূর্ত্তিগুলির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখনই ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ফরাসি পণ্ডিত Taine (টেনের) কথা মনে পড়ে। "If you prick them they will bleed." বিখ্যাত সমালোচক ল্যাণ্ডার বলিয়াছেন,—"He was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life." সমগ্র চিত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখান অসম্ভব। ঘরে ঘরে সেক্স্পীয়র আছে, মূল গ্রন্থ খুলিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন। এস্থলে আমরা কেবল পতিপ্রাণা-সাধ্বী-রমণী ডেস্‌ডিমোনার একখানি পবিত্র, সরল ও সুন্দর 'ফটো' তুলিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি। জীবন্ত প্রতিরূপ

* Macbeth, Act. V. Scene I.

অঙ্কিত করিতে এবং পাতিব্রত্যের পুণ্যময়ী ছবি আঁকিতে কবি কিরূপ শক্তিশালী, পাঠক তাহা উপলব্ধি করুন।

ডেস্‌ডিমোনা জীবন্ত-রমণী-মূর্ত্তি! ঠিক যেন ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। আমরা তাঁহার দুঃখের বিস্তার, দুঃখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের আবেগ দেখিতে পাই। তাঁহার কোমলগণ্ড-প্রবাহিত ফোঁটা ফোঁটা চক্ষের জলে তাহা দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই—সেই ভূলগ্নজানু-রমণীর স্থির লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে। তাঁহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বরে তাঁহার বেদনাব্যথাপূর্ণ মর্ম্মকথা শুনিতে পাই; শুনিয়া—মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হই। তাঁহার কান্না দেখিয়া কান্না পায়, চক্ষে জল দেখিয়া আমাদেরও শোকাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া যায়—বুক ভাসিয়া যায়। যিনি পরের চক্ষে অশ্রু সৃজন করিয়া, পরের জন্য পরকে কাঁদাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সহানুভূতির মূর্ত্তিমান কবি।

ডেস্‌ডিমোনা—স্নেহশালিনী, সতী এবং পতিগতপ্রাণা। স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত এবং ব্যথিত হইয়া যখন গৃহদূরীকৃতা হইলেন, তখনও তিনি বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন,—'আমি এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না।' আবার ডাকিবামাত্র 'প্রভু' বলিয়া নিকটে উপস্থিত। পরক্ষণেই যখন 'স্বৈরিণী,' 'দুশ্চারিণী' প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে বিনাপরাধে অপমানের একশেষ করিলেন, তখনও ডেস্‌ডিমোনা—'আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন,' বলিয়াই নীরব। তার পর পতিস্নেহে বঞ্চিতা হইয়া বিশ্বসংসার

শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন,—ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"Alas, Iago!
What shall I do to win my Lord again?
Good friend, go to him; for by this light of heaven
I know not how I lost him; here I kneel;—"

রজনী গভীরা—প্রকৃতি নিস্তব্ধ—জগৎ সুপ্ত। ডেস্‌ডিমোনাও নিশীথ-শয্যায় শায়িতা ও সুপ্তা। এমন সময়ে ঘাতকের বেশে ওথেলো 'বধ করিব' বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন সহসা তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—শয্যাপার্শ্বে স্বামীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; ভীতি-কম্পিত-স্বরে কেবল এই মাত্র বলিলেন—'ভগবন্! আমায় রক্ষা কর।' স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিনয় বা অস্নেহভাব প্রকাশ করিলেন না। আবার মৃত্যুভয়ে ভীতা হইয়া যখন এক দিনের জন্য জীবনভিক্ষা চাহিলেন, পাষণ্ড তাহাও শুনিল না, তখনও তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডলে রাগের বা অভিমানের ছায়াটিও পরিলক্ষিত হইল না। মৃত্যুর প্রাক্কালেও যখন ইমিলিয়া প্রভুপত্নীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'এ সর্ব্বনাশ কে করিল?' তখনও ডেস্‌ডিমোনার সেই একই ভাব, পতিপদে অচলা ভক্তি। ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—'আমি নিজে করিয়াছি—অপরে নহে।

আমি চলিলাম, পতিপদে আমার প্রণাম বলিও।' সাধ্বী রমণী মরণকালেও স্বামীর অপরাধের কথা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেক্‌স্পীয়রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির একটিও অসম্পূর্ণ নহে। যে চরিত্রের যেটি নিজস্ব তাহা দিয়াই তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। নিজ প্রকৃতির বিশেষত্ব দিয়া তাহা পুরাইতে হয় নাই। কিন্তু অপরাপর কবিগণ সেরূপে চরিত্রাঙ্কন করিতে পারেন নাই। মিল্টনের স্যাম্‌সনে, আমরা স্যাম্‌সনে মিল্টনকেই দেখিতে পাই এবং স্যাম্‌সনের দুঃখে তাঁহারই দুঃখ অনুভব করি। বায়রণ আপন দুঃখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। মনুষ্যচরিত্রের সকল অংশ আলোচনা করিবার অবসর তিনি পান নাই, প্রবৃত্তিও ছিল না। তাই তিনি যেখানে নাটক লিখিতে গিয়াছেন, গ্রন্থগুলি নাটকাকার সত্ত্বেও গীতিকাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চরিত্রগুলি ম্যানফ্রেড্, চাইল্ড্ হ্যারল্ড্, ডন্ জুয়ান্ সকলেই স্বয়ং বায়রণ, কেবল বাহ্য পরিচ্ছদ বিভিন্ন মাত্র। তাহাদের দুঃখে আমরা বায়রণের দুঃখই প্রত্যক্ষ করি, তাহাদের জন্য অশ্রুপাতে বায়রণের আত্ম-দুঃখই যেন শান্তি হয়। বায়রণ যখন কেবল আপনার দুঃখই নানারূপে মানবের সম্মুখে ধরিতেছেন, সেক্‌স্পীয়র সেই সময়ে মানব সাধারণের সুখদুঃখের চিরন্তন নির্ঝর ও প্রবাহ লইয়াই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। এখন মানবের নিকট বায়রণের সঙ্কীর্ণ দুঃখই অধিক মুল্যবান বিবেচিত হইবে, না—অনাদি কাল

হইতে মানব যাহার জন্য যেরূপে কাঁদিয়া আসিতেছে, তাহাই অধিকতর প্রীতিপদ হইবে? বায়রণের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হইলে, তাঁহার জীবনের দুঃখের ইতিহাস কিঞ্চিৎ জানা চাই। মিল্টনের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইলে, তৎ-কালীন ইংলণ্ডের তমিস্র গগন ও পঙ্কিল জীবনের সহিত পরিচয় আবশ্যক; কিন্তু সেক্স্পীয়রের নাটকের সুখদুঃখ, জাতিধর্ম্ম, শিক্ষিতঅশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে মানব মাত্রেরই উপভোগ্য। রামায়ণ হিন্দুর যতটা উপভোগ্য, অপরের ততটা নহে। প্যারাডাইস্ লষ্ট খৃষ্টানের যত প্রিয়, অপরের তত নয়। কিন্তু সেক্স্পীয়র সক-লেরই সমান প্রিয়, সমান উপভোগ্য। সেক্স্পীয়রের চরিত্র সকল, বিভিন্ন প্রকৃতির মানবগণের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহাদের উৎপত্তি সকল সময়েই হইতেছে। যে কোন সময়ে যে কোন দেশেই তাহাদের উৎপত্তি সম্ভব। আর্থার কেবল প্রাচীন বৃটনেই সম্ভব, একিলিস্ কেবল প্রাচীন গ্রীসেই সম্ভব, কিন্তু ম্যাক্‌বেথ সকল দেশেই জন্মিতেছে।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি লোকের ভক্তির হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাডাইস্ লষ্টের প্রভাব কমিতে পারে, আদিরসের বিতৃষ্ণার সহিত ভারতচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হইতে পারেন, কিন্তু যত কাল মনুষ্যপ্রকৃতি এইরূপ থাকিবে, তত দিন সেক্স্পীয়রের চরিত্র-গুলি সর্ব্বদেশে জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

৪

যে সময় বঙ্গভাষা অনন্ত তমিস্র বঙ্গকারাগার মধ্যে চিরা-পরাধিনী বন্দিনীর ন্যায় অবরুদ্ধা, স্বেচ্ছাচারিত্ব ইতর-সুলভ ভাব ও ভাষায় যখন পূজনীয়া মাতৃভাষার মলিন-দীন-হৃদয়খানি ব্যথিত ও লজ্জিত, ইংরাজি-শিক্ষিত-গর্ব্বোদ্ধত-বঙ্গসন্তান যখন সদর্পে সোৎসাহে মাতৃভাষার উপর প্রাণ-দীর্ণ-বিজাতীয়-ভাষায় গালি বর্ষণ করিয়া, উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মনে মমে ধন্য হইতেছিলেন, বঙ্গোদ্যানে তখন এমন একটি নিপুণ মালী ছিলেন না, যিনি লুপ্তপ্রায় সুকুমার সুরভিসৌন্দর্য্যপূর্ণ কুসুম বৃক্ষগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া, বহুল প্রসারিত অপর্য্যাপ্ত কণ্টক বৃক্ষগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেন এবং উদ্যানের শোভাসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতে পারেন। এমন একটি অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন না, যিনি এই ইংরাজি শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল দুর্য্যোধন, দুঃশাসন গুলিকে সবংশে বিনাশ করিয়া, দেশের কল্যাণ এবং সমাজের শন্তি সংস্থাপন করেন।

এমন একটি বিপ্লব-বিধ্বস্ত-দুর্দ্দিনে সংসার-যুদ্ধে বঙ্গ-সাহিত্য-সারথি বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অগণিত শত্রুমিত্রের মধ্যে আপনার অব্যাহত-গতিরথ চালাইয়া দিলেন। সম্মুখে গীতার উপদেশগুলি ফুটিয়া উঠিল। আত্মত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে বদ্ধপরিকর—সেই কর্ম্মযোগী মহারথী আপনার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত অনুরাগ, শিক্ষা, সর্ব্বোপরি সার্ব্বভৌম সহানু-ভূতি ঢালিয়া দিয়া অসংখ্য বাধাবিপত্তি, ঘৃণাউপেক্ষার মধ্য

দিয়া, অদ্ভুত সাহসে কর্ম্ম করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই অপ্রতিহত কর্ম্মস্রোতে সমাজের পূতিগন্ধপূর্ণ আবর্জ্জনারাশি এবং সাহিত্যের স্তূপীকৃত কণ্টকরাশি উন্মূলিত হইয়া কোন্ অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া গেল, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অবসরটুকুও প্রাপ্ত হইল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিত সমাজের সহিত প্রীতি ও স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য এমন একটি অভিনব, সরল, প্রাণময়ী ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা আপামর সাধারণের বোধগম্য ও প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের দ্বিতীয় কার্য্য ভাষার সহিত ভাবের উদ্বাহোৎসব সংসাধন।

ঘরে ঘরে গ্রন্থ পাঠের ধূম পড়িয়া গেল। বাঙ্গালি পড়িতে শিখিল। বাঙ্গালি পাঠক হইল। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, 'আমি বাঙ্গালা ভাষার পাঠক সৃষ্টি করিয়াছি; আমার পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে।' প্রকৃতই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে এক নূতন বন্যা আনিয়াছেন। সেই নব বন্যার নব প্লাবনে বঙ্গের পঙ্কিল, বিস্বাদ জলরাশি কোন্ মহাসমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে, কে বলিবে? যিনি সাহিত্যরাজ্যে এইরূপ নূতন বন্যার সৃষ্টি করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই বাঙ্গালা ভাষার গুরু, বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরু এবং বাঙ্গালি জাতির গুরু।

তাঁহার সৃষ্টির অধিকাংশ চরিত্র যদিও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তীভূত, সেক্স্পীয়রের মত তাঁহার সমগ্র মানবহৃদয়ের নানা

প্রবৃত্তি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা ছিল না, তথাপি তিনি যে প্রবৃত্তিটির বিষয় বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন, মনে হয়। তাঁহার সৃষ্টিতে প্রণয়বৃত্তির পরিপুষ্টি বা বিকাশই আমরা অধিকতর প্রোজ্জ্বল দেখিতে পাই। প্রণয়ই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপাদান। ভালবাসাই তাঁহার চরিত্র সৃষ্টির মূলভিত্তি। যেহেতু তিনি জানেন, ভালবাসাতেই মানুষকে আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়। যিনি সেই পবিত্র ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানবমনে আত্মবিসর্জ্জন ভাব উদ্দীপিত করিতে পারেন, তিনিই সমগ্র মানবজাতির হিতৈষী বন্ধু।

প্রণয়—এক, ভোগ-লালসা—আর। প্রণয়, মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে, ভোগ-লালসায় পাপের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত করে। প্রণয়—স্বর্গ, ভোগ-লালসা—নরক। তিনি জানেন—প্রণয়, স্নেহের সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া বিশ্বসংসারকে আলিঙ্গন করে, মানুষকে আত্মবিস্মৃত করে এবং পরসুখে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয়। ভোগ-লালসাই মানুষের যত সর্ব্বনাশের মূল। ভোগ-লালসা হইতেই তাঁহার নগেন্দ্রনাথের সৃষ্টি,—গোবিন্দ লালের উৎপত্তি।

আমরা তাঁহার কাব্যপটে এই প্রণয়ের মূর্ত্তি গুলি বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাই। সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি অবস্থাভেদই ইহার মূল কারণ। এক একটি রমণী যেন এক একটি প্রণয়ের ছবি। এক একটি পুরুষ যেন এক একটি প্রণয়-

চিত্র। প্রণয়মূর্ত্তি অঙ্কনে কবি এমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তির গঠন করিয়া লইতে পারিতেন। চরিত্রাঙ্কনে এই টুকুই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব।

এইক্ষণ চরিত্রাআঙ্কনে তাঁহার কিরূপ সহানুভূতিতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ছিল, তাহারই দুই একটি চিত্র পাঠককে উপহার দিতেছি।

পাঠক, এক বার কতলুখাঁর ভীষণ কারাগারে নিশীথ-শয্যাশায়ী রুগ্ন, চৈতন্যহারা বন্দীর পার্শ্বে উপবিষ্টা একটি উদ্ভিন্নযৌবনা, অনিন্দ্যরূপা রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। চাহিয়া দেখুন—আত্মবিস্মৃত হইয়া রমণী বন্দীর জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় বিনিযুক্তা। স্বহস্তে ব্যজন করিতেছেন, স্বহস্তে ঔষধ সেবন করাইতেছেন, স্বহস্তে ক্ষতস্থলে ঔষধ লেপন করিতেছেন। চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—'আর আশা নাই, সেই রাত্রেই জ্বরত্যাগের সময়ে জগৎ সিংহের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।' রাত্রি যত বাড়িতেছিল, রমণীর হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে তত আঘাত করিতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। আবার চিকিৎসক বলিলেন—'রাজপুত্র রক্ষা পাইলেন,' অমনই রমণীর মুখশ্রী প্রফুল্ল হইল,—মেঘেতে বিজলী হাসিল। পাঠক অবশ্য চিনিতে পারিয়াছেন, এ মূর্ত্তিমতী দেবীরূপিণী নবাবপুত্রী আয়েষা। নিষ্ঠুর কতলুখাঁর গৃহে কি অপূর্ব্ব স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি!

জগৎ সিংহের পার্শ্বে তিলোত্তমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন; কারাগারে এইরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া তিনি আয়েষাকে

সংবাদ দিলেন। আয়েষা তৎক্ষণাৎ কারাগারে উপস্থিত হইলেন; তিলোত্তমার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। কি অপরূপ দৃশ্য! কবি আয়েষার ক্রোড়ে তিলোত্তমাকে দিয়া, কি মধুর—কি মনোহর দৃশ্যই দেখাইলেন!

আর একস্থলে,—জগৎ সিংহের সহিত তিলোত্তমার পরিণয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে,—আয়েষা আপনার বহু মূল্য আভরণে তিলোত্তমাকে ভূষিত করিয়া দিলেন। তিলোত্তমা সে সকলের বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন আয়েষা বলিলেন—'ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিওনা; তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।'

তার পর বিদায় গ্রহণ। আয়েষা কহিলেন,—'তিলোত্তমে, আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কাল হরণ করিব না; জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্ন গুলিন্ দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার —তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে যত্নে রাখিও।' * * * *

বিদায় গ্রহণ করিয়া আয়েষা আপন আবাসে ফিরিয়া আসিলেন, "তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। এক বার মনে করিতেছিলেন—'এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।' আবার ভাবিতে লাগিলেন—'জগৎ

সিংহ শুনিয়াইবা কি বলিবেন?' আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন; ভাবিলেন—'এ লোভ সম্বরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।''

'এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ-পরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।'

কবি আয়েষার হৃদয়কপাট উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে যে বহ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, তাহা পরিষ্কার রূপে আমাদিগকে দেখাইলেন। ইহাই অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য প্রকৃতির সহানুভূতি-বিকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বাঙ্গালির অন্তঃপুরের এক খানি প্রকৃত ও সুন্দর আলেখ্য। সূর্য্যমুখী তাহারই একটি সজীব-প্রায় মূর্ত্তি। সূর্য্যমুখী চরিত্রে আমরা কবির নিঃস্বার্থ ভালবাসার ছায়া পরিস্ফুট দেখিতে পাই। যে ভালবাসায় অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ-বিসর্জ্জন হয়, সেই ভালবাসার পূর্ণতা সূর্য্যমুখীতে প্রোজ্জ্বল প্রভাসিত। তিনি স্বামিসুখে আত্মহারা, স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতপ্রাণা এবং স্বামীর মঙ্গলার্থে আত্মসুখ-বিসর্জ্জন-তৎপরা। তিনি পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার মঙ্গল বলি দিতে পারেন। তাঁহার প্রাণদায়িনী ভালবাসা—অসীম, অনন্ত, অপার! গভীর সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার প্রেম—উদার। তাই তিনি নিশিদিন বলিতেন—'প্রেম চাও প্রেম দিব; সুখ চাও প্রাণ দিয়া সুখী করিব।' আবার কুন্দের প্রতি স্বামীর অনুরাগ দেখিয়া স্বামীরই সুখের জন্য স্বামীকে কুন্দ দিলেন; আপনি

উদ্যোগী হইয়া স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন। ইহা কি সূর্য্যমুখীর অল্প স্বার্থত্যাগের পরিচয়? ইহাকেই বলে—প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন। অপর দেশে এরূপ প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর দেশে সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হয়।

সূর্য্যমুখী পতিকে সুখী করিতে গিয়া নিজে সুখী হইতে পারিলেন না। তাই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া আরও যন্ত্রণা বাড়িল, পতি— সপত্নী লইয়া গৃহে সুখ-ভোগ করিতেছেন বলিয়া যন্ত্রণা নহে; স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা বলিয়া যন্ত্রণা। তখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, এ সংসারে তাঁহার কিছুই নাই, সমস্তই তাঁহার স্বামীর। তাই তিনি আপনাকে আপনি বলিতে লাগিলেন,—"স্বামীর আর কেহ থাকে থাক, আমার ত স্বামী বই আর কেহই নাই, আমাতে ত স্বামী বই আর কিছুই নাই।" আর বলিলেন,—"আমাতে যখন স্বামী বই আর কিছুই নাই, তখন আমার স্বামীর কুন্দর জন্যে আমার জ্বালাইবা কি, আর যন্ত্রণাইবা কি? আমার স্বামীও যেমন আমার, আমার স্বামীর কুন্দও তেমনই আমার।" তখন তিনি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গোবিন্দপুরে ছুটিলেন। সূর্য্যমুখীর প্রেমে যে একটু স্বার্থের মসী লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা একেবারেই মুছিয়া গেল। তাঁহার প্রেম এখন নিঃস্বার্থ হইল। সূর্য্যমুখী এখন নিঃস্বার্থ-প্রেমময়ী-দেবীরূপিণী হিন্দুরমণী। সহানুভূতি-প্রবণ-হৃদয় ভিন্ন এমন নির্ম্মল ও সুন্দর প্রেমের ছবি কোন কবিই আঁকিতে সমর্থ নহেন।

তার পর কুন্দের কথা—

কুন্দ—বড় লজ্জাশীলা, সরলা ও 'মুখচোরা' বালিকা। সে যাকে ভালবাসে, তাকে চায়, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কাঁদে। আবার সময় সময় অভিমান ভরে জলে ডুবিয়া মরিতে যায়। কুন্দ যখন দুঃখের ঝঞ্ঝাবাতে আকুল হয়, তখন মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারেনা,—কেবল নীরবে কাঁদে,—নয়নের জল নয়নে রোধ করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে। কুন্দ মুখ ফুটিয়া কথা না কহিলেও তাহার বিষাদবিজড়িত মুখখানি দেখিয়া আমরা তাহার অন্তরের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি,—তাহার 'বুক-ফাটা' নীরব আর্ত্তস্বর শুনিতে পাই, শুনিয়া—ব্যথিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত হই।

কুন্দকে আমরা দুইবার স্বার্থত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। যখন কমল বলিল—'সোণার সংসার ছারখার গেল;' কুন্দ বুঝিল। তখন সে কমলের সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে রাজি হইল; চক্ষু মুছিয়া বলিল—'যাব।' এই এক বার। আর এক বার, বাপীতটে বসিয়া সে তাহাকেই সূর্য্যমুখীর সুখের অন্তরায় এবং কষ্টের একমাত্র কারণ বুঝিতে পারিয়া, ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল। অবশেষে যখন নগেন্দ্রের উপেক্ষায় কুন্দ মর্ম্মাহত হইল, তখন জন্মের মত আত্মত্যাগ করিল। কুন্দ বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল।

কুন্দের জন্য আমাদের অশ্রুবারি ঝরে। কুন্দ ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িল,—নয়ন মেলিতে না মেলিতে নয়ন মুদিল।

কুন্দের মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তের কথা কয়টি আমাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে। যখনই মনে পড়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগে :

"কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমায় পাইয়াছি, তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

কমলমণিতেও কবি-সহানুভূতির সুস্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত ; কমল—'পরিপূর্ণ প্রফুল্লতার মূর্ত্তিমতী কল্পনা।' সে যখন যে কাজ করে, হাসি মুখে করে। তাহার প্রাণে কখনও দুঃখের লেশ বা বিষাদের ছায়াটিও দেখিলাম না। কমল পরোপকার-রতা, পরদুঃখকাতরা। সে পরকে আপনার করিতে জানে এবং করে। কমল ব্যথিত জনের 'সুখ-শান্তি-কুঞ্জ-ভবন।' ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথা দূর করিতেই কমলের জন্ম। সূর্য্যমুখী যখন নগেন্দ্র নাথের বিশাল হৃদয়ে এক বিন্দু অশ্রু নিক্ষেপের ও স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি কমলের কাছে কাঁদিতে আসিতেন ; কমলকে মনের দুঃখ কহিতেন। কমল তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, স্বীয় ক্ষুদ্র হৃদয় পার্শ্বে তাঁহাকে স্থান দিত,—সান্ত্বনা করিত। আবার সূর্য্যমুখী যখন দেখিলেন, স্বামী কুন্দতে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট, তখন মনের দুঃখে কমলকে লিখিলেন,—"পৃথিবীতে আমার যদি কোন সুখ থাকে ত, স্বামী ; পৃথিবীতে আমার যদি কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী ;

পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে, সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। * * * এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁর মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই বুঝিতে পারি।” উত্তরে কমল লিখিল,—“স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না; স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল।” কমলের উপদেশে সূর্য্যমুখী আশ্বস্ত হইল।

কবির আর একটি চরিত্রের সমালোচনা করিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব।

যিনি দিল্লীশ্বর—জগদীশ্বরের ন্যায় সর্ব্বপ্রতাপসম্পন্ন সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সাহানসাহ ঔরঙ্গজীবের একমাত্র প্রাণপ্রতিম দুহিতা, যাঁহার পদে কণ্টক ফুটিলে সে ব্যথা সমস্ত ভারতহৃদয় উপলব্ধি করিবে, যাঁহার তর্জ্জনী হেলনে সমস্ত ভারত বিন্ধ্যের ন্যায় নোয়াইয়া পড়িবে, যিনি প্রেম কি, জানেন না, প্রেম অর্থে যাঁহার অভিধানে আত্মসুখ ও আত্মতৃপ্তি

ভিন্ন অন্য কোন অর্থই ছিল না,—যাঁহার মণিমুক্তা-জরি-জহরৎ-জড়িত বাম পদের পদাঘাতে প্রেম ও করুণার বক্ষ যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠিত, এক দিন অকস্মাৎ সেই সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যশালিনী মূর্ত্তিমতী বিলাসিনীর হৃদয়ের 'কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। শিরায় শিরায় সুখ-মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল। আরামের পুষ্পশয্যা, চিতাশয্যার মত তাঁহাকে দগ্ধ করিল। তখন তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত-প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিলেন। তাহার পরে আর সুখ পাইলেন না, কিন্তু আপনার সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইলেন। জেব্-উন্নিসা সম্রাট-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র-যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে তিনি অনন্ত জগদ্বাসিনী রমণী।'

এই নব জাগ্রত রমণীর পূর্ব্ব হৃদয় টুকু হইতে কবি বিলাস-সুখরতা বিশ্বের প্রতি নারীর হৃদয়রহস্য উদ্ভিন্ন করিলেন। উদার সহানুভূতি না থাকিলে কোন্ কবি এমন গভীর এবং চির প্রসারিত মূর্ত্তিমান পাপের বক্ষে, পবিত্র প্রেমের পূত-মন্দাকিনী বহাইতে পারেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মরাজ্য ও ভাবরাজ্যে সহানুভূতির কত দূর প্রভাব, এপর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করা গেল। একণে মানবের নিত্য নৈমিত্তিক কঠিন কার্য্য-সম্পাদনে, সহানুভূতি কত দূর পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। ধর্ম্ম ও ভাবরাজ্য অপেক্ষা এস্থলে সহানুভূতির ক্রীড়াস্থল অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার বটে, সহানুভূতির বিশ্বব্যাপী-পক্ষ এখানে অনেকটা সংগত ও সংক্ষুব্ধ বটে, কিন্তু তথাপি ইহার প্রভাব বড় কম নহে।

যেমন কোন প্রবল দুর্নীতি-কুৎসিত-আচার-পরায়ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানবিবর্জ্জিত জাতিকে প্রবুদ্ধ ও পরিত্রাণের জন্য এক এক সময়ে ঈশ্বরনিয়োজিত এক এক জন মহাপুরুষ ধর্ম্মরাজ্যে আবির্ভূত হন, যেমন মানবের কঠোর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণের নিমিত্ত কবি তাঁহার ভাব-সৌন্দর্য্যপূর্ণ মঙ্গল-কলস লইয়া উপস্থিত হন, সেইরূপ নির্ম্মম বিজেতাদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত জাতির ত্রাণের জন্যও সময় সময় কর্ম্মবীর মহাত্মগণের জন্ম হইয়া থাকে। এই অত্যাচার, উৎপীড়ন নিবারণের জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অসহ্য শারীরিক ও পারিবারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সহানুভূতিই কেবল সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাঁহাদের বাহুকে সবল ও হৃদয়কে উত্তপ্ত রাখে।

এস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইতিহাস হইতে এবম্বিধ কয়েকটি মহাপুরুষ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

১

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন মোগল-বীর্য্যের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজপুত বংশ সমূহ মরুভূমির ক্ষণভঙ্গুর বালুকা-স্তূপের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ম্লেচ্ছানুগ্রহেই পুনরায় আপনার কলঙ্কিত-শির উন্নত করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল, যখন বিপুলবীর্য্য-মোগলের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন, তদানীন্তন রাজন্যবর্গের নিকট আকাশ-কুসুম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল, তখন সেই দেশব্যাপী নিরুৎসাহ ও অবসাদের দুর্দ্দিনে, স্বাধীনতা ও কুল-সম্মান-দৃপ্ত মিবারের প্রতাপ-রবি **প্রতাপ সিংহের** অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অপমানিত ও উৎপীড়িত স্বদেশের করুণ ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি অপরাপর রাজন্যবর্গের ন্যায় মোগলকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া, মোগলের পদচ্ছায়ায় বসিয়া নিরুদ্বেগ ও বিলাসভোগ শ্রেয়ঃজ্ঞান করেন নাই। মোগলের বিজয়-পতাকা হস্তে লইয়া, মোগল-রাজশ্রীর উন্নতি ও গৌরবের জন্য স্বজাতির রক্তে কখনও আপনার অসি কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি রাজভোগ-বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া, সুখ-পালিত দারা-পুত্র-পরিবার সমভিব্যাহারে

কঙ্কর-কণ্টকময় অরণ্যে অরণ্যে, দুর্গম বন্ধুর পাহাড়ে পাহাড়ে, জঠর-যাতনার তীব্রতা সহ্য করিয়াও পরিশেষে যবন-সৈন্যের গ্রাস হইতে চিতোরের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

২

হল্‌দিঘাটের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে এই স্মরণীয় মহাপুরুষের পার্শ্বে আমরা আর একটি আত্মত্যাগপরায়ণ মহাত্মাকে দেখিতে পাই। বিপুল মোগল-অনিকিনীর দুর্ভেদ্য-ব্যূহ মধ্যে যখন একাকী বিপদগ্রস্ত প্রতাপ চরমোৎসাহে রণোন্মত্ত, অসংখ্য মোগল-সৈন্য যখন কেবল মিবারের রাজছত্রের উচ্ছেদ সঙ্কল্পে আপনাপন সর্ব্বনাশী অসি চালনা করিতেছে, তখন 'জয় প্রতাপের জয়' শ্রবণ-ভৈরব-রবে রণপ্রাঙ্গন কম্পিত করিয়া, মিবারের রাজছত্র আপন মস্তকে ধারণ করিয়া, রাজছত্রের সহিত রাজজীবনের সমস্ত আপদ, বিপদ আপনার শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় আত্মজীবন প্রদান করিয়া যিনি সেই লোক-বিশ্রুত মহারাণার জীবন রক্ষা করিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক—**ঝালাপতি-মান্না** সহানুভূতির অন্যতম প্রোজ্জ্বল আদর্শ।

হিন্দুবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যখন যবন-অত্যাচারে ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, সেই সময়ে স্বদেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া **গুরুগোবিন্দের** প্রাণ কাঁদিয়া

উঠিল। তিনি দেখিলেন, শিখজাতিকে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত না করিলে আর দেশের মঙ্গল নাই। এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মকে এক নূতন আকারে গঠিত করিলেন। তাহার মূলভিত্তি—শৌর্য্য উদ্দীপন। তাহার ফলে শিখজাতি একটি অসাধারণ বীর-সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। আত্মস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিয়া তিনি এক অভিনব বীরজাতির সৃষ্টি করিলেন। স্পর্শমণির মোহন-কর-স্পর্শে সকলেই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মোগলসম্রাট এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার অনেক অনুচর দেহ ত্যাগ করিল। বিপক্ষের চক্রান্তজালে তাঁহার আত্মীয় স্বজনও জড়িত হইয়াছিল, এবং পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তথাপি গুরুগোবিন্দ নিজ কর্ত্তব্য পালনে ক্ষণকালের জন্যও বিমুখ হন নাই। সম্রাট তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিবার জন্য বহু অনুরোধ করি-লেও তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পত্রের ভাষায় তাঁহাকে সদর্পে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান,—আমার শিক্ষায় চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।'

এই শিখগুরু অদ্ভুত আত্মত্যাগের ফলে শিষ্যদলে যে সমবেদনার শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য শিখগণ আজ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গুরু-

গোবিন্দ সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে শিখদিগের হৃদয় হইতে বীর্য্য-বহ্নির অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের বিকাশ হইত না।

৪

যে ইটালীর সভ্যতাগৌরবে এক সময়ে সমস্ত যূনানী জগৎ চমকিত হইয়াছিল, যাহার রাজদণ্ডের অপ্রতিহত প্রভাবের নিকট ভূমণ্ডলের বিংশতিভাগ অবনত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, যাহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ব্যবহারশাস্ত্র, চিত্রভাস্কর্য্যের মহিমা আধুনিক সভ্য য়ুরোপের সকল বিষয়ের আদর্শ স্থল, কালচক্রের রহস্যময় আবর্ত্তনে এক্ষণে তাহার গৌরব-ধ্বজার দণ্ডটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইটালীর বর্ত্তমান অবনত অবস্থাকেও অপেক্ষাকৃত গৌরবের অবস্থা বলিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইটালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক উপরাজ্যে বিভক্ত এবং অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির অত্যাচারে উৎপীড়িত, সেই সময় জেনোয়া নগরে **জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনীর** জন্ম হয়। স্বদেশকে বিজাতীয় উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপরাজ্য গুলিকে একীভূত করিয়া একটি দেশব্যাপী সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি তরুণ বয়সে আপন জীবিকা (আইন ব্যবসায়) পরিত্যাগ করিয়া কখনও লেখনী হস্তে পত্রসম্পাদকরূপে, কখনও সভাস্থলে বক্তারূপে, কখনও নির্ব্বাসিত অবস্থায় সুদূর প্রবাস হইতে, কখনও কারাগৃহ

হইতে, কখনও শাসনকর্ত্তারূপে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিবিধ প্রকারে অসহ্য ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া চির জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সহস্র অগ্নিপরীক্ষায়ও তাঁহার সহানুভূতি-উত্তপ্ত-হৃদয়কে দমন করিতে পারে নাই। ইটালীর পুনর্গঠনে তাঁহার পবিত্র নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

৫

দীর্ঘকাল দাসত্ব-নিগড়ে নিবদ্ধ থাকিয়া এবং বিদেশীয় বিজেতাগণের প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া যখন ইটালীবাসিগণ পুনঃ স্বাধীনতার আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, কিন্তু কাল-চক্রাবর্ত্তনে পুনরায় যে ইটালীর উলঙ্গ গৌরব-ধ্বজা-দণ্ড স্বাধীনতার রক্তপতাকা-বিভূষিত হইয়া স্বজাতি এবং স্বদেশের বিজয় ঘোষণা করিতে পারে, পর-কর-গত-রাজ্য আবার আপন করে আসিতে পারে, এরূপ চিন্তা—যাঁহারা ছিন্নশিরমস্তিষ্কের অলীক কল্পনা মনে করিয়া নিস্তেজ ও নিরুদ্যম হইয়া সতত পর-পদ-লেহনেই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের এই তেজোহীন, বলহীন এবং রক্তহীন অন্তঃকরণে তেজ, বল এবং রক্ত সঞ্চারিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা এক বলদৃপ্ত আত্মত্যাগপরায়ণ মহাপুরুষকে অশ্রু-প্লাবিত ইটালী রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ইনিই সেই সহানুভূতির মূর্ত্তিমান দেবতা মহাত্মা—গ্যারিবল্ডী।

বাল্যকাল হইতেই তিনি কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন; বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ তাহা পরিপুষ্ট হইতেছিল। সাহস আর সঙ্কল্পদৃঢ়তা সহানুভূতির অন্যতর সহচর-সহচরী। আত্মত্যাগের সহিত এতদ্‌সম্মিলনে সহানুভূতি এক অভূতপূর্ব্ব ফল প্রসব করিয়া থাকে। পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; জগতের ইতিহাসের পাতা খুঁজিলে দুই একটি মাত্র পরিলক্ষিত হইবে। সদনুষ্ঠানে সাহসী ও দৃঢ়সঙ্কল্প না হইলে, মানব সহানুভূতির অধিকারী হইতে পারে না। যে নির্ভয়শীলতা আত্মপ্রশংসা লাভের জন্য মানবকে দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে উত্তেজিত করে, সে নির্ভয়শীলতা সহানুভূতির সাহস নহে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর সত্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে মানবহৃদয়ে যে অসাধারণ বল সঞ্চার করে, তাহাই সহানুভূতির সাহস। তিনি শত বিপদে বিচলিত হন না, শত উদ্যম ও আশার নিষ্ফলতায় হতাশ হন না এবং তিনি দুঃখ দুর্ভাগ্যের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে মুহূর্ত্তের জন্যও আলোড়িত হন না। আবার বাধাবিঘ্নবিপদে যাহার সঙ্কল্প চূর্ণীকৃত হয়, তিনি সহানুভূতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী পাত্র। যিনি এ দেবীর চরণধূলি মস্তকে লইয়া আপনাকে কৃতার্থন্মণ্য করিতে চাহেন, তাঁহাকে ভীষ্মের ন্যায় সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া সংসার-সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এইরূপ সাহস এবং দৃঢ়-সঙ্কল্পতায় বুক বাঁধিয়া, গ্যারিবল্ডী অসীম বাধাবিঘ্নবিপদে বিচলিত না হইয়া, অসাধারণ সহিষ্ণুতাবলে ইটালীর পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। মিবারের প্রতাপ

সিংহের ন্যায় ইনিও দুঃখদারিদ্র্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বাধাবিঘ্নের শৈলস্তূপ পদাঘাতে অপসারিত করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন।

৬

কলম্বস্‌ কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে কতকগুলি ইংরাজ বণিক তথায় গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইংলণ্ডবাসিগণ সে সময়ে তাঁহাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অযথা করবৃদ্ধি এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অযথা অত্যাচার কাহিনী তৎকালে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ পার্লিয়ামেণ্টের কর্ণেও স্থান পাইল না। বহুকাল হইতে এইরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ঔপনিবেশিক দল এবং আদিম অধিবাসিবর্গ একে-বারেই বিব্রত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে এক জনের প্রাণে এই সমবেদনানুভূতি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। মানব সাধারণের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পার্লিয়ামেণ্টে শত আবে-দন, শত অশ্রুপাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখন তিনি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্যক্তিসাধারণের দুঃখ দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এবং দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিয়া, অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের কানে সহানুভূতির এক মধুর মন্ত্র-সুধা-ধারা ঢালিয়া দিলেন। হল-

চালনাভ্যস্ত সামান্য কৃষকটিও বাদ দিলেন না। অমনি প্রতি হৃদয়ে প্রতিহিংসাবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। উপযুক্ত সময়ে তাহারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, যুদ্ধে জয় লাভ হইল; আমেরিকার প্রশস্ত বক্ষে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উত্তোলিত হইল। তাঁহার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইল।

যে মহাপুরুষের ঐকান্তিকী চেষ্টায়, অসীম অধ্যবসায়ে এবং অদ্ভুত আত্মত্যাগের ফলে, আজ আমেরিকা স্বাধীনতার উচ্চগ্রামে উন্নীত, এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্যদেশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, তিনিই সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা—**সার্ জর্জ্জ ওয়াসিংটন।**

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ সহানুভূতি-প্রণোদিত-প্রাণে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশপূজায় স্বার্থত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উপায়ে যাঁহারা নিঃস্বার্থ-পরোপকারিতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এস্থলে পাঠককে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিব।

১

বসন্তকাল। কাননে কাননে কুসুম-সৌরভ—ভ্রমর-গুঞ্জন। বসন্ত-পবনের মৃদুল-হিল্লোল। ভূতলে ফুলের হাসি—আকাশে অমিয়-রাশি। বসন্ত-নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান। অগণ্য নক্ষত্র-রাজি চতুর্দ্দিকে বিভাসিত—সুশোভিত; যেন প্রকৃতির নীল চন্দ্রাতপতলে অগণ্য হীরকখণ্ড ঝক্‌মক্ করিতেছে। এ হেন নিশিতে শ্বেতরাজ্যে কোন যুবক চিন্তাভারাক্রান্ত-চিত্তে নীরবে নির্জ্জন কক্ষে পালঙ্কোপরি শায়িত। যুবকের হৃদয়সমুদ্রে

অগণ্য তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তন্মধ্যে একটি উত্তাল-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়সমুদ্রকে বড়ই উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। তাই, যুবক সারা নিশি অনিদ্রায় কষ্টে কাটাইতেছিলেন।

যখন পূর্ব্বদিকে উষার শুভ্র হাসি প্রকটিত হইল, তখন তাঁহার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় যুবক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—এক অশীতিপরবৃদ্ধ শুভ্র-বেশধারী ধর্ম্মযাজক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান; দক্ষিণ হস্তে যষ্ঠি, বাম করে ধর্ম্মগ্রন্থ, পরিধানে লবেদা--সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, পায়ে পাদুকা, শিরে শিরস্ত্রাণ। দেহ দীর্ঘাকৃতি, সুদীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুরাজি জানু চুম্বন করতঃ বায়ুভরে দোদুল্যমান। নয়ন বিস্ফারিত, ললাট প্রশস্ত—নাসিকা সুদীর্ঘ ও সুন্দর। তিনি ধীরগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "—বৎস, চল,—আমার সঙ্গে আইস বিশেষ প্রয়োজন, দেবীর আদেশ।" যুবক উত্তর করিলেন,--

"দেব, আপনি কে? কোথায় যাইব? দেবী কে?"

ধর্ম্মযাজক। "সমুদ্রতীরে,—সেখানে সব শুনিবে। শীঘ্র আইস।"

যুবক আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তৎপশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একখানি সুবৃহৎ অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে। তরণী সুশোভিত—সজ্জীকৃত। তরী-বক্ষে দণ্ডায়মানা শারদ-চন্দ্রকর-স্নিগ্ধ-বর্ণা এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। ললাট প্রশস্ত, সুগোল ও সুন্দর। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত—

দৃষ্টি স্থির, করুণা-বিজড়িত।"পশ্চাদ্ভাগে অবেণী-সম্বদ্ধ-কেশ-জাল জানু-বিলম্বিত হইয়া মন্দ মারুত-হিল্লোলে ঈষৎ দুলিতেছে। পরিধানে শ্বেত পট্টবসন। দুই করে দুই খানি রক্তবর্ণের পতাকা। তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে—**আত্মোৎসর্গ** আর **আত্মসুখ-বিসর্জ্জন**। তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীর-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি বহুমূল্য আভরণে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। তাঁহার দিব্য লাবণ্যময়ী দেহকান্তি দেখিয়া যুবক ভক্তিগদগদকণ্ঠে সোৎসাহে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দেব, ইনি কে? এমন ভক্তিপ্রীতিবিমণ্ডিত পবিত্র মূর্ত্তি ত কখনও নয়নগোচর করি নাই! কে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি?"

ধর্ম্মযাজক একটুক্ রুক্ষ স্বরে উত্তর করিলেন,—

"দেখিতেছ না, ইঁহার প্রশস্ত ললাটপ্রদেশে স্বর্ণাক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে? ইনি মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ **সহানুভূতি-দেবী**; তোমায় লইতে আসিয়াছেন।"

রমণী ধর্ম্মযাজককে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অভীষ্ট সিদ্ধ?"

ধর্ম্মযাজক। সিদ্ধ।

রমণী। তবে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ধর্ম্মযাজক অভিবাদন করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আকাশে অদৃশ্য হইলেন।

রমণীর ইঙ্গিতানুসারে যুবক নিঃশব্দে পোতাধিরোহণ

করিলেন। ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। তরণী সমুদ্র-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীরবেগে ছুটিল।

সাহসে নির্ভর করিয়া যুবক দেবীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। "কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি? রমণী কে? কেনইবা আমায় লইতে আসিয়াছেন?" বিবিধ প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থিত হইয়া যুবকের মনে কৌতূহলশিখা উদ্দীপ্ত হইতেছিল। যুবক অনিমেষ নয়নে কেবল তাঁহার মুখকান্তি দেখিতে দেখিতে চলিষ্ণু তরণীসহ চলিতে লাগিলেন।

যুবকের মনে কৌতূহলশিখা উদ্দীপ্ত, উৎকণ্ঠা প্রবলা দেখিয়া দেবী সস্নেহে মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন,—"বৎস, ঐ যে অদূরে সাগরবক্ষে স্বর্ণতরী সদৃশ একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ ভাসমান দেখিতেছ, চল—ঐ দ্বীপরাজ্যে অবতরণ করিবে। দেখিতে পাইবে দ্বীপ-বক্ষ-সমানীত ক্রীতদাসদলের কি দারুণ দুর্দ্দশা! সহস্র সহস্র হতভাগ্য ব্যক্তিগণ স্বজন-বিবর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বাসিতবৎ দ্বীপ-কারালয়ে দাসত্ব-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, যন্ত্রণার কঠোর নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত এবং জন্মের মত স্বজন-মিলন-সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভবিষ্যজীবন ঘোর অন্ধকারময় দেখিতেছে। চল,—ঐ দেশে চল,—হতভাগ্যদিগের শৃঙ্খল মোচন করিয়া তাহাদের জীবনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দাও।"

অনতিবিলম্বে অর্ণবতরী দ্বীপপ্রান্তে সমুপস্থিত হইল। পুনরপি দেবী কহিলেন, "ধর বৎস, এই রক্ত পতাকা হস্তে

লও, আর এই সহিষ্ণুতার সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান কর; ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও।” এই বলিয়া দেবী যুবকের অঙ্গে স্বহস্তে সহিষ্ণুতার বর্ম্ম পরাইয়া দিলেন। দুই করে আত্মোৎসর্গ ও আত্মসুখ-বিসর্জ্জনের রক্ত পতাকা দুই খানি সমর্পণ করিয়া সস্নেহে তদীয় শিরশ্চুম্বন করিলেন; এবং আবার কহিলেন, “আর বিলম্ব করিওনা—কার্য্যোদ্ধারে অগ্রসর হও।”

দেবীর অঙ্গ সংস্পর্শে যুবকের দেহে অপার বলসঞ্চার হইল। এক লম্ফে উড্ডীন-পতাকা হস্তে তীরে অবতীর্ণ হইয়া সবেগে গন্তব্যপথে প্রধাবিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তরীসহ দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তময়ী অনন্তে মিশাইয়া গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া যুবক আর সে দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না।

তদনন্তর দ্রুত-পাদ-বিক্ষেপে যুবক দ্বীপ-কারাগৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন--ক্রীতদাসদলে কারাগার পরিপূর্ণ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সবল-দুর্ব্বল সকলে একই দৃঢ় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। মাতৃস্তন্যপায়ী অবোধ শিশুটিও কারাগৃহের কঠোর নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ফলতঃ শিশুর চীৎকারে, যুবতীর রোদনে, বৃদ্ধার হাহাকারে কারাগৃহ সতত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রক্ষিবৃন্দের অত্যাচারে তাহাদের হৃদয় বিকম্পিত। তাহারা যেন এক একটা নির্দ্দয়তার জীবন্ত-প্রতিমূর্ত্তি!

এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুবকের চিত্ত উদ্বেলিত হইল। দুঃখে, ক্লেশে, সমবেদনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অমনই দেবী-প্রদত্ত রক্ত পতাকা কারাগৃহের ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পতাকা-সঞ্চালিত পবন-হিল্লোল যাহার গাত্রে লাগিতেছিল, সে-ই তন্ময় হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ যুবকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে। সমগ্র রক্ষিদল ও দাসপ্রভুগণ তাঁহার পদানত হইয়া পড়িল। যুবক কারাগৃহের দ্বারোন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসদলের কঠোর শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিলেন। তাহারা যুবককে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া সহাস্য বদনে স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিতে লাগিল। দেবীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। যুবকের মনোরথ পূর্ণ হইল। অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দেখিলেন—প্রভাত হইয়াছে, কক্ষাভ্যন্তরে মৃদুমন্দ বসন্তানিল প্রবাহিত হইতেছে।

যুবকের হৃদয়—প্রফুল্ল, প্রাণ—উল্লসিত। গত নিশির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে যুবক অপার সুখ-সলিলে নিমজ্জিত; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "প্রাণপাত করিয়াও যদি দেশের এই অসহনীয় দুর্দ্দশা মোচন করিতে পারি, তাহা হইলেও কুণ্ঠিত হইব না। আমার প্রতি দেবী প্রসন্না, তাই স্বপ্নে দর্শন দিয়া অভয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রভাত-স্বপ্ন প্রায়ই নিষ্ফল হয় না।" যুবকের প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহানুভূতির উপাসকমণ্ডলীর পবিত্র হৃদয় প্রকৃতই প্রেমের উৎস বিশেষ। 'প্রেমই তাঁহা-দিগের হৃদয়ের শোণিত। সেই শোণিতধারা বিশুষ্ক ও ক্ষীণ হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া তাঁহারা তাহার বলসঞ্চার করিয়া থাকেন, জীবনীশক্তির উদ্বোধন করিয়া লয়েন। নিদাঘের তপনতাপে ভূমি উত্তপ্ত হয়, গাছপালা বিশুষ্ক হইয়া যায়, লতাপল্লব ঢলিয়া পড়ে। তাহাদের দুঃখের মর্ম্মন্তুদপ্রহারে সহানুভূতি প্রকাশের জন্যই যেন আবার নিশাসমাগমে চন্দ্রোদয় হয়, সুধাকর স্বকীয় হৃদয়নিহিত সুধাধারা ঢালিয়া দিয়া উত্তপ্ত ভূমি শীতল করে, গাছপালা সজীব করে, লতাপল্লব সিক্ত করে, ঝরা-ফুলে হাসি ফুটায়। সহানুভূতির শিষ্যমণ্ডলীও ঠিক সেইরূপ আপনার প্রেম-পীযূষধারা ঢালিয়া মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি এমন করিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই দেবতা—তিনিই বিশ্বপ্রেমিক।

বহুকাল হইতে জগতে দাসত্ব-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ধরিত্রীবক্ষ হইতে এই মহা কণ্টক উত্তোলন করিবার চেষ্টা অনেকেই করিতেছেন না। তদানীন্তন নিগ্রোদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইলে কি ভীষণ পৈশাচিক-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, দাস-প্রভুদল তাহার জ্বলন্ত-নিদর্শন। নিগ্রোদাস সামান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় প্রতি দিন হাটে বাজারে বিক্রীত হইত।

ইংলণ্ডের এইরূপ বিভীষিকাময়ী অবস্থা দেখিয়া যে যুবকের

প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনিই উল্লিখিত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মহাত্মা—উইল্‌বার ফোর্স্‌। তিনি ২০ বৎসর কাল নানাবিধ বিপদবাত্যা সহ্য করিয়া অবশেষে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। ইংলণ্ডের বক্ষ হইতে দাসত্ব-প্রথারূপ মহাকণ্টক উৎপাটন করিলেন। ধন্য উইলবার ফোর্স্‌! ধন্য তোমার জীবন! তুমিই প্রকৃত নিঃস্বার্থ-বিশ্বপ্রেমিক!

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের আর একজন যুবকের মনে কারাগার-পর্য্যবেক্ষণ-স্পৃহা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একে একে ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী প্রভৃতি য়ুরোপের নানাস্থানের কারাগার সমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারাগারের বিভীষিকাময় ভাব দেখিয়া তিনি বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন,—প্রত্যেক কারাগৃহেই বীভৎসের করাল-মুখ-ব্যাদান, যন্ত্রণার জ্বলন্ত-দাবানল, বিষাদের মসীময়ী-ছায়া! কোথাও দুঃখের হাহাকার, উৎকণ্ঠার গভীর-চীৎকার, শোকের উত্তপ্ত-দীর্ঘশ্বাস! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যুবকের হৃদয় এক অননুভূতপূর্ব্ব-ভাবের আঘাত ও প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। রক্ষিবৃন্দের অত্যাচারে হতভাগ্য কারাবাসিগণ সতত সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত ও

উৎপীড়িত। কারাগারের এই ভীষণ অত্যাচার নিবারণ জন্য যুবক বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার সমস্ত মানসিক শক্তি, সমস্ত সম্পত্তি তাহাতে বিসর্জ্জন দিলেন। অবশেষে বহু ক্লেশ, বহু পরিশ্রম এবং বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, কারাগৃহের এই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা নির্ব্বাপিত করিলেন। হতভাগ্য বন্দিগণের বিশুষ্ক প্রাণে শান্তির পূত-নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

যিনি য়ুরোপের এবম্বিধ বহু কারাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হতভাগ্য কারাবাসী ও কারাবাসিনীগণের দারুণ দুঃখ বিমোচনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত— মহাত্মা **জন্ হাউয়ার্ড্।**

কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া যে হাহাকার-ধ্বনি বাহিরে যাইত না, হাউয়ার্ড্ তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া জগতে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বন্দী অনাহারে, অনিদ্রায় এবং রক্ষীদলের প্রহারে কারাগৃহে অকালে প্রাণ বায়ু বিসর্জ্জন করিত, কারাগারের অন্ধকারময় নিভৃত-নিবাসে কত শত শত নরনারী মলমূত্রে পচিয়া মরিয়া থাকিত, পৃথিবী তাহার সন্ধান রাখিত না—জগৎ তাহা জানিত না; আজ মহাত্মা হাউয়ার্ড্ সেই অসংখ্য গুপ্তহত্যার সংবাদ জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালে, সমগ্র য়ুরোপ বুঝিল— হাউয়ার্ড্ তাঁহার কি মহদুদ্দেশ্য সাধনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগের ফলে আজ য়ুরোপের সমস্ত কারাগৃহ সংশোধিত হইয়াছে।

আবার এদিকে দেখিতে পাইলেন, কারাবাসিদিগের ন্যায় গলিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সংবাদও কেহ রাখে না। শত শত ব্যক্তি যে পৃথিবীর এক কোণে থাকিয়া পচিয়া গলিয়া মরিতেছে, কেহই তাহার সন্ধান লয় না। হাউয়ার্ড্ তাঁহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া নিজে তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন, রোগীর রুগ্নশয্যা পার্শ্বে বসিয়া জননীর ন্যায় তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড্ ভবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করিয়া তিনি পরার্থে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কদাপি কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হয় না।

৩

আর এক সময়ে চিতোরের এক ধাত্রী, চিতোর রাজকুমারকে রক্ষা করিতে গিয়া, কৃতান্ত-কিঙ্কর-সদৃশ ঘাতকের নারকীয় লালসা নিবৃত্তির জন্য, স্বকীয় নিদ্রিত শিশুসন্তানকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে রাজপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং অসাধারণ ধৈর্য্যে হৃদয় দৃঢ় করিয়া নিজের চক্ষের সমক্ষে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের ছিন্নশির অবলোকন করিয়াও অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলেন। **ধাত্রী পান্নার** এই আত্মত্যাগপূর্ণ অলৌ-

কিকী সহানুভূতি ভারতীয় ইতিহাসের একটি জ্বলন্ত-চিত্র। শিপাহি-বিদ্রোহের সময়, নরশোণিত-পিপাসু সিপাহিদিগের সেই ভীষণ লোমহর্ষণ অভিনয়ের মধ্যে, ইংরাজ বালকের প্রাণ-রক্ষার জন্য, কত স্নেহময়ী জননী যে এরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করাও দুরূহ।

৪

আধুনিক বঙ্গে যতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে **বিদ্যাসাগরই** বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও সমাদৃত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ প্রতিভাশালী পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ মাত্র বঙ্গবাসীর হৃদয়পটে যে অর্দ্ধ দেবত্বপ্রাপ্ত, অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব-সম্পন্ন মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, এমন আর কোন বঙ্গীয় মহাপুরুষের নাম শ্রবণে হয় কিনা সন্দেহ। তিনি রাজা ছিলেন না সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বদেশীয়ের নিকট বিদ্যাসাগরের এই উচ্চ আসন প্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রকার দীনতা ও কাতরতার প্রতি সহানুভূতি বিকাশই উহার মূল কারণ। বিদ্যাবত্তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি আরও অনেক গুণ

আনুসঙ্গিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সহানুভূতিই তাঁহার বলিষ্ঠ অন্তঃপ্রকৃতির প্রাণ স্বরূপ। বঙ্গসাহিত্যের উপর তাঁহার প্রভাব অতি বিস্তৃত ছিল। তিনি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে যে অর্দ্ধ গঠিত অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বহু শতাব্দী পরেও তাঁহার স্বদেশীয়গণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন। কিন্তু সাহিত্য-জগতে তাঁহার যশ যতই প্রসারিত হউক না কেন, উহার মূল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি মূলতঃ Philanthropist (মানব সাধারণের হিত সাধক) ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার (philanthropism) লোক-হিতব্রতেরই অংশীভূত। আজকালকার প্রচলিত philanthropism এর সহিত বিদ্যাসাগরের philanthropism এর একটুক্ বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সে প্রভেদ আসল ও নকলে। যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই অনুকরণীয়, এই সূত্রের উপর তাঁহার philanthropism সংস্থাপিত ছিল না। তাহাতে একটুক্ জাতীয়ত্ব সংমিশ্রিত ছিল। তাহা দুঃখীর দুঃখে অশ্রু-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস।

হিন্দু বিধবা রমণীদিগের দুঃসহ দুঃখ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন নিবন্ধন সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার নিরাকরণ জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরদুঃখ-কাতর হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিরই অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার শাস্ত্রীয় তর্ক সমীচীন না হইতে পারে, দেশাচার-চালিত

সমাজকে শাস্ত্রানুশাসনে চালিত করিবার চেষ্টা অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সরল বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হইতে সাহস করে, এরূপ লোক খুব কমই আছে। কুলীন কন্যাদিগের জীবন্মৃত অবস্থা নিবারণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। বহুবিবাহপ্রথা আপনা হইতেই ক্রমে বিরল হইতেছিল, ইংরাজ-সংস্পর্শে শিক্ষা-বিস্তার এবং দেশের ধনহীনতার ফলে উহার পরিসর আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিশেষ ফল না হইলেও তাঁহার উদ্যম, মহাপ্রাণতার নিদর্শন সন্দেহ নাই।

দেশীয় শিক্ষিত যুবক মণ্ডলী দ্বারা এদেশে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষাদান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, বিদ্যাসাগরই তাঁহার 'মেট্রোপলিটানে' প্রথম ইহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিয়া দেশে ইংরাজিশিক্ষা বিস্তারের উপায় নিরূপিত করিয়া দেন, এবং বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত করিয়া নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের সহিত ভাষারও উন্নতি সাধন করেন। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র-পালন, বিপন্ন অসহায়কে আশ্রয়দান এবং নানা রূপ সদনুষ্ঠানের শত শত দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনী-পাঠক অবগত আছেন। জন্মভূমির সকল প্রকার দৈন্যের প্রতি সরল সহানুভূতিই তাঁহার অসংখ্য সদনুষ্ঠানের মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ সহানুভূতিবলে দয়াবৃত্তি-প্রণোদিত হইলে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না; ধন, প্রাণ কিছুর দিকেই দৃক্‌পাত করিতেন না। দয়াবলে

তিনি মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করিতে পারিতেন। দয়াবশে তিনি সংসারের সর্ব্বপ্রধান কষ্ট দারিদ্র্যভয়, ঋণভয়কেও অবহেলা করিতে পারিতেন। যিনি প্রকৃত দয়াশীল তাঁহার দয়া বিচার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না। বিদ্যাসাগর শুধু 'বিদ্যার সাগর' নহেন, 'দয়ার সাগরও' বটেন।

সম্পূর্ণ।